মুহাম্মদপল্লীর এইসব দিনরাত্রি

শাকুর মজিদ

নুহাশপল্লীর এইসব দিনরাত্রি   শাকুর মজিদ





Nuhashpollir Eishob Dinratri

by Shakoor Majid
Price Bdt 300.00
US $ 15.00
Cover Design :: Dhruba Esh

Anyaprokash<< Dhaka<< Bangladesh
www.e-anyaprokash.com

An ANYAPROKASH Publication

Bdt 200



ISBN 978 984 502 113 5



কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ না-ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন; মেঘের ওপর বাসা বেঁধেছেন। মৃত্যুর আগে, চিকিৎসার বিরতিতে, তিনি মা ও মাতৃভূমির টানে আমেরিকা থেকে ছুটে এসেছিলেন। স্নেহময়ী জননী তো বটেই নুহাশপল্লীর গাছগুলোর সান্নিধ্যও জীবনের শেষ দিনগুলোতে হুমায়ূনকে উজ্জীবিত করেছিল; পরম সুখ ও শান্তি দিয়েছিল।

গাজীপুরে নিজের গড়া নন্দনকানন নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদ জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কীভাবে কাটিয়েছেন, তারই খণ্ডচিত্র এই গ্রন্থে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, নুহাশপল্লী গড়ে ওঠার গল্পও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। এই নন্দনকাননের কোথায় কী আছে সেটিও ফুটে উঠেছে এই বইয়ে—বিশেষত ওষুধি বৃক্ষের বাগানকে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদের ভাস্কর্যপ্রীতির কথাও জানতে পারবেন পাঠক। নুহাশপল্লীতে পুরোপুরি চিত্রায়িত 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'-এর প্রসঙ্গও রয়েছে। আর এক শ্রাবণ মেঘের দিনে নুহাশপল্লীর লিচুতলায় হুমায়ূন আহমেদের শেষ শয্যা কীভাবে রচিত হলো, স্বজন ও ভক্ত-অনুরাগীদের ভালোবাসায় তিনি সিক্ত হলেন—তার মর্মস্পর্শী বিবরণও রয়েছে এখানে।

প্রচ্ছদ :: ধ্রুব এষ



শাকুর মজিদের জন্ম সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে ১৯৬৫ সালের ২২ নভেম্বর। পিতা মরহুম আব্দুল মজিদ, মাতা বেগম ফরিদা খাতুন। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে শাকুর জ্যেষ্ঠ। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্থাপত্যে স্নাতক। কবিতার মাধ্যমে লেখালেখি শুরু। পরবর্তী সময়ে গল্প, নাটক, ভ্রমণকাহিনি লিখেছেন অনেক। নাটকের সকল শাখায় তার বিচরণ। কুড়ি বছর বয়সে সিলেট বেতারে তার লেখা নাটক প্রথম প্রচার হয়। *লন্ডনী কইন্যা*, *নাইওরী*, বৈরাতী, করিমুন নেছা, চেরাগসহ বেশ কয়েকটি টেলিভিশন নাটক ও টেলিফিল্মের রচয়িতা তিনি। নিজে নাটক-টেলিফিল্ম পরিচালনাও করেছেন। বাউল শাহ আব্দুল করিমের জীবন ও দর্শন নিয়ে লিখেছেন মঞ্চনাটক *মহাজনের নাও*। তাঁর জীবন নিয়ে বানিয়েছেন তথ্যচিত্র *ভাটির পুরুষ*। এছাড়াও দেশ-বিদেশের ভ্রমণচিত্র নিয়ে প্রায় তিন শতাধিক প্রামাণ্যচিত্র বানিয়েছেন। ছবি তুলে, নাটক-টেলিফিল্ম ও তথ্যচিত্র বানিয়ে দেশে-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। দেশ ভ্রমণ তার একটি বড় নেশা। প্রায় ত্রিশটি দেশ ভ্রমণ করেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তার ১৪টি ভ্রমণকাহিনি। এছাড়াও মঞ্চনাটকের আলোকচিত্র নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম আলোকচিত্র গ্রন্থ *রিদম অন দ্যা স্টেজ*, আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *ক্লাস সেভেন ১৯৭৮*।

ব্যক্তি জীবনে শাকুর মজিদ একজন পেশাদার স্থপতি এবং আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন ফ্যাকাল্টি।

আলোকচিত্র :: ইবন ইবতিশাম

মুহাম্মদপল্লীর এইসব দিনরাত্রি

শাকুর মজিদ

সুহাস্যপল্লীর এইসব দিনরাত্রি

শাকুর মজিদ



অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ : একুশের বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক : মাজহারুল ইসলাম, অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ : কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
মূল্য : ৩০০.০০ টাকা [০০ মার্কিন ডলার]

Nuhashpollir Eishob Dinratri
by Shakoor Majid

Published in Bangladesh
by Mazharul Islam, Anyaprokash
e-mail : anyaprokash38@gmail.com
web : www.e-anyaprokash.com

ISBN : 978 984 502 113 5

একদিন তাঁর বাসায় গিয়ে দেখি, বারান্দার দুই পাশ কাচ দিয়ে ঢেকে তার এক কোণে নতুন কেনা একটা লেখার টেবিল বসানো হয়েছে। টেবিলের উপর এক বাক্স কাগজ, কয়েক রকমের কলম, ক্লিপ, স্টেপলার এসব। হাসতে হাসতে বললেন, 'লেখালেখি না করতে করতে হাতে জং ধরে গেছে। দেখি চেষ্টা করে হয় কি না। ওকে নিয়ে আমার কত স্মৃতি, হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও শেষ করতে পারব না।'

তিনি হুমায়ূন আহমেদকে চেনেন ১৯৮৩ সাল থেকে। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর মিসির আলি বিষয়ক প্রথম বই 'দেবী' ছাপতে দিয়েছিলেন তাঁকে। সেই থেকে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা। হুমায়ূন যখন 'দখিন হাওয়া'য় অ্যাপার্টমেন্ট ডেভেলপ করলেন, তখন প্রায় জোর করে একটা ফ্ল্যাটও গছিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। এক যুগ ধরে তাঁরা থাকেন মাত্র দশফুট দূরত্বে, একই বিল্ডিংয়ে। দীর্ঘদিন পেশাদার সাংবাদিকতা করার পরও হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে লিখতে বসে তাঁর কলম চলে না। এক বর্ণও লেখা আসে নি গত কয়েক মাসে। হুমায়ূনকে নিয়ে গভীর অন্তঃপ্রাণ এই মানুষটি **আলমগীর রহমান** (প্রকাশক : অবসর ও প্রতীক প্রকাশনী)।

All the world's a stage
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,

William Shakespeare
As You Like It Act 2, scene 7

নুহাশপল্লীর এইসব দিনরাত্রি প্রসঙ্গে

প্রায় ৩২ বছর ধরে হুমায়ূন আহমেদকে আমি চিনি। কিন্তু তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয় ২০০৮ সালের গোড়ার দিকে। তাঁকে নিয়ে দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেছি আমার অপর বই 'হুমায়ূন আহমেদ : যে ছিল এক মুগ্ধকর'-এ। এ বইটি কেবলমাত্র—নুহাশপল্লীকে ঘিরে আমার ব্যক্তিগত কিছু অনুভূতির প্রকাশ।

নিজের অনুভূতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নুহাশপল্লীর গাছপালা, ভাস্কর্য, নানারকমের স্থাপনা এবং সেসবকে কেন্দ্র করে হুমায়ূন আহমেদের যাপিত জীবন নুহাশপল্লীতে কেমন ছিল, সেটি প্রকাশের চেষ্টা করেছি।

বইটি প্রকাশের জন্য বন্ধুবর প্রকাশক মাজহারুল ইসলামের ঐকান্তিক আগ্রহ আমার জন্য বাড়তি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

এ বইতে ব্যবহৃত বেশির ভাগ ছবিই আমার তোলা। কিছু ছবি সংগ্রহ করেছি। দু'টো ছবি ইন্টারনেট থেকে নেওয়া। ফটোগ্রাফারের নাম না জানার কারণে নাম দিতে পারি নি। কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি।

শাকুর মজিদ
১৩ জানুয়ারি, ২০১৩
shakoormajid@yahoo.com

তাঁর প্রথম পছন্দ

১১ মে ২০১২। মাঝরাত থেকেই টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরাগুলো বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের বাইরে দাঁড়িয়ে। ভেতরে দশ-বারোজনের একটা দল। সবার প্রতীক্ষা— কুয়েত এয়ারওয়েজের বিমানটি সাড়ে চারটায় নামবে তো!

বিমান নামে খানিকক্ষণ দেরি করে। ভিআইপি লাউঞ্জ থেকে ভেতরের দিকে একটা সিঁড়ি বিমানবন্দরের আরেকটা করিডরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বিমান থেকে প্রথমেই বের হয়ে আসেন হুমায়ূন আহমেদ। সাদাকালো স্ট্রাইপের শার্টের উপর হালকা ছাই রঙের কোট, মাথায় হ্যাট, কোলে নিনিত। মাজহার এসে কোল থেকে নিনিতকে নিয়ে নিজের কোলে রাখে। পেছনে পেছনে নিষাদ আর শাওন।

হুমায়ূন আহমেদ ইতিপূর্বে বহুবার বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন। কিন্তু এরকম কঠিন উষ্ণ সংবর্ধনা কখনো তাঁর পাওয়া হয় নি। তিনি নিজেও এতগুলো কাছের মানুষকে দেখে বেশ বিহ্বল। মুখে হাসি আর বিস্ময়ভরা চোখ। করিডর দিয়ে হেঁটে নিচের লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বসা হলো। মাজহার সবার পাসপোর্ট নিয়ে ভেতরে গেল ইমিগ্রেশনের সিল মারা আর ব্যাগেজগুলো নিয়ে আসতে। হুমায়ূন আহমেদ বসে পড়েন আড্ডায়।

নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে যে সাংবাদিকেরা তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন তারাই সংবাদ পাঠিয়েছেন অনলাইন নিউজ এজেন্সিতে। হুমায়ূন সেখানে স্পষ্ট জানিয়েছেন

নুহাশপল্লীর একতলা যে বাড়িতে হুমায়ূন আহমেদ থাকতেন





চিকিৎসা বিরতিতে দেশে এসে নুহাশপল্লীতে যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে সংবাদকর্মীদের মুখোমুখি হুমায়ূন

যে, তিন সপ্তাহের চিকিৎসা বিরতিতে তিনি দেশেই আসতে চান। কারণ দেখিয়েছেন ৪টি। তার প্রথমটি হলো–প্রিয় নুহাশপল্লীর গাছপালার সঙ্গে সময় কাটানো, দ্বিতীয় কারণ, মা'র সঙ্গে দেখা করা, তৃতীয় কারণ, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া আর চতুর্থ কারণ–নতুন বাজারে ওঠা ছোট ছোট গোল আলুর সঙ্গে জিয়ল মাছের [কই, শিং] ঝোল দিয়ে গরমভাত খাওয়া।

ইচ্ছাবিলাসী হুমায়ূনের সব ইচ্ছা একে একে পূর্ণ হবে। বিমানবন্দরেই দেখা মিলেছে তাঁর প্রিয় বন্ধুদের অনেকেরই সঙ্গে, বাদ বাকি সব আয়োজন ঠিক করে রাখা, নুহাশপল্লীতে।

হুমায়ূন বিমানবন্দরের লাউঞ্জ থেকে যখন বেরুলেন, তখন রাতের অন্ধকার কেটে গেছে। সূর্য উঠেছে কী উঠে নি, সেটা অবশ্য ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, তবে যে পরিমাণ আলো এসেছে তাতে মাঝরাত থেকে শিকারিদের মতো ওঁত পেতে থাকা টেলিভিশন চ্যানেলের ফটোগ্রাফারদের সানগান ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নি।

চোখের সামনে এত সাংবাদিককে একসঙ্গে দেখে তাঁর চোখে বিস্ময়, মুখে প্রথমেই যে কথাটি বললেন, তা হলো–আমি সত্যিই অভিভূত। এরপর রজনীকান্ত সেনের একটা গানের কথা বললেন, 'আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাও নি/যা দিয়েছ তারই অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাও নি।' ধন্যবাদ



উৎফুল্লচিত্তে শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদের স্ত্রী শাওন

জানালেন সাংবাদিকদের। তাঁরা প্রশ্ন করলেন চিকিৎসা নিয়ে, ডাক্তার কী বলল—এ সব। হুমায়ূন আহমেদ শাওনের দিকে ইঙ্গিত করেন। বলেন, এ বিষয়টা ও গুছিয়ে বলতে পারবে ভালো। শাওন কথা বলে। আমরা পাশে দাঁড়িয়ে শুনি।

একসময় শেষ হয় সাংবাদিকদের কথা বলা।

হুমায়ূন আহমেদ একটা কালো রঙের জিপে উঠে বসেন, সামনে ড্রাইভারের পাশের আসনে। এবারও তার কোলে নিনিত। পেছনে শাওন বসে নিষাদকে নিয়ে। হলুদ রঙের টি-শার্ট পরা নিষাদ-নিনিত দুই ভাইয়ের চোখে ক্লান্তির শেষ নেই।

গাড়ি ছাড়ার আগে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, চলো, নুহাশপল্লী আসো। ক্যানসার হাসপাতালের ব্যাপারে কথা আছে। ওটা অরগানাইজ করতে হবে তো।

আমি ঠিক করে রেখেছি, আজ নুহাশপল্লীতে যাব না। আজ তাঁর একান্ত নিজের সময় দরকার। জেটলেগ কাটানোর জন্য এই সকালে তাঁর ঘুমানো প্রয়োজন। তা ছাড়া নুহাশপল্লীতে তাঁর মা ও বোন আছেন। মাজহারকে রাজি করালাম, আমি কাল আসব।

হুমায়ূনকে নিয়ে গাড়ি ছুটে যায় তাঁর প্রিয়তম বাসস্থান নুহাশপল্লীর দিকে।

আমি নিজের বাসায় চলে যাই। কাল-পরশু দেখা হবে নুহাশপল্লীতে। এই নুহাশপল্লী নিয়ে আমাদের কত স্মৃতি, কত গান।

নুহাশপল্লীর বাসভবণের অন্দর মহল

যেমন করে এই পল্লী

নুহাশপল্লী গড়ার গল্পটা আমি শুনি মিনহাজুল ইসলামের কাছ থেকে। এক সময় তিনি হুমায়ূনের নুহাশ চলচ্চিত্রের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯৯৭ সালের কথা। হুমায়ূন আহমেদ তখন গাজীপুরের এই অঞ্চলে *সবুজ ছাতা, সবুজ সাথী* নামক দু'টো সরকারি বিনিয়োগের স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রচারমূলক ধারাবাহিকের কাজ করছিলেন। এ প্রামাণ্য নাটকগুলোর শুটিংয়ের জন্য ঢাকার আশপাশে গ্রামাঞ্চল হিসেবে এ জায়গাটিই পছন্দ করেন। এ সময় এখানকারই এক দুর্গম গ্রামের একটা বাড়ি ভাড়া করেন ১৫ দিনের জন্য। বৃষ্টি বাদলার কারণে এই ১৫ দিনে শুটিং শেষ হয় না। আরও ২ দিন লেগে যায়। কিন্তু ওই বাড়ির মালিক অতিরিক্ত ২ দিন থাকতে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে হুমায়ূন আহমেদ খুব মনঃক্ষুণ্ন হন। সম্ভবত এই মন খারাপ থেকেই ওই অঞ্চলে বা আশপাশে একটি শুটিং হাউস বা বাগানবাড়ি তৈরির আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

এর আগে সাভারের কাছে তাঁর বন্ধু আসাদুজ্জামান নূরের শ্বশুরবাড়িতে একটা ৪ বিঘার বাগানবাড়িতে তিনি শুটিং করতে গিয়েছিলেন। সেই বাড়ি দেখে জমির দামটাম জিজ্ঞেস করেন এবং নিজের ভেতরে একটা জঙ্গলবাড়ি কেনার বাসনা ধারণ করেন।

নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁর সমস্ত সহকারীকে। এ সময় মিনহাজুর রহমান তাঁর নুহাশ চলচ্চিত্রের ম্যানেজার। তিনি লেগে যান বিক্রয়যোগ্য বাড়ি বা জঙ্গল খোঁজার কাজে।

ঠিক এসময় গাজীপুরের এক তরুণ চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তার নাম ডা. এজাজুল ইসলাম।

ডা. এজাজ একদিন দেখা করতে গিয়েছিলেন পরমাণু বিজ্ঞানী প্রফেসর ডা. এম. এ করিমের সঙ্গে।

ডা. এজাজ তখন নতুন পাশ করেছেন নিউক্লিয়ার মেডিসিন-এ। তাঁর শিক্ষক ডা. করিমের কাছে গিয়েছিলেন সার্টিফিকেট উঠানোর কাজে। একথা-সেকথার পর ডা. করিম জানালেন যে, হুমায়ূন আহমেদ তাঁর বাল্যবন্ধু। সার্টিফিকেট উঠানোর প্রসঙ্গ ছোট হয়ে এল। ইনিয়েবিনিয়ে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে দেখা করার। হয়েও গেল। কাকরাইলে তখন নুহাশ চলচ্চিত্রের অফিস। গাজীপুর নিবাসী তরুণ চিকিৎসক এজাজুল ইসলাম এসেছেন হুমায়ূন-দর্শনে। হুমায়ূন আহমেদ তাকে



নুহাশপল্লীর প্রথম স্থাপনা। ১৯৯৮ সালে বাড়িটি বানানো হয়েছিল, দুর্বৃত্তরা বাড়িটি পুড়িয়ে ফেলে ২০০০ সালে। ছবি : এ এফ তোফাজ্জল হোসেন সাদেক (চ্যালেঞ্জার)

একটা কাজ দিয়ে ভাগিয়ে দিলেন। যাও, আমার জন্যে একটা জঙ্গলবাড়ি খুঁজে আনো, দশ-বিশ বিঘা যা হয়, সমস্যা নাই—যেখানে গ্রামের বাড়ি বানানো যায়, কিছু গাছপালা থাকবে আর নিজের বাড়িতে বসে বসে যাতে [illegible] নাটকের শুটিং করা যায়।

শুরু হয়ে যায় জমি খোঁজা। ডা. এজাজই খুঁজে বের করেন ২০ বিঘার জংলি জমি। দাম সম্ভবত বিঘাপ্রতি লাখ টাকা। সেভাবেই কেনা।

মাজহারদের সঙ্গে হুমায়ূনের সম্পর্ক ১৯৯৮ সাল থেকে। তার মাত্র কিছুদিন আগে তিনি প্রথম দফার বিশ বিঘা জায়গা নিয়েছেন মাত্র। মাজহার বলল, আমি যেদিন প্রথম এই জায়গায় আসি তখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছিল একটা কাঠের বাংলো মাত্র। এছাড়া টিনশেড আরও কয়েকটি ঘর ছিল। যাতায়াতের কোনো রাস্তা ছিল না। একটা পুল আছে পিরুজালী গ্রামের আগে। সেই পুল ভাঙা। এ পাড়ে গাড়ি রেখে ট্রলারে করে পুরো গ্রাম ঘুরে নুহাশপল্লীর বর্তমান দিঘিটার পেছন দিয়ে কাদামাখা পথ মাড়িয়ে উঠতে হতো জঙ্গলবাড়িতে। ২০০১-০২ সালের দিকেও হুমায়ূন আহমেদের হাসির নাটকগুলোতে যে অজ পাড়াগ্রাম এবং মহিষের গাড়ির পথ দেখা যেত, তা সবই তাঁর বাড়ির পথ।

১৯৯৭ সালে হুমায়ূন আহমেদ যখন এই জঙ্গলবাড়ি কেনেন তাঁর কিছুদিন পর থেকেই *অন্যদিন-অন্যপ্রকাশের* সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান হুমায়ূন আহমেদ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। মাজহারের কাছে শুনেছি তখন খুব ঘনঘন তাঁরা হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে নুহাশপল্লী যেত। কোনো কোনো সপ্তাহে ৩ বারও নুহাশপল্লী গিয়েছে তাঁরা। এর মধ্যে আরও প্রায় ২২ বিঘা জমি তিনি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন। মাজহার বলে, এই ৪২ বিঘা জঙ্গলবাড়ির প্রায় প্রতিটি বিবর্তনের আমরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

প্রথম দেখা

২০০৮ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে মৌলভীবাজারের বড়লেখার একটা গেস্ট হাউজে এর আগে প্রথমবারের মতো সংক্ষিপ্ত আড্ডায় বসেছিলাম আমরা এক বিকেলে। পরদিন ঢাকা চলে আসি। তার ৩/৪ দিন পর তিনি সরাসরি চলে আসেন নুহাশপল্লীতে। সেই ইউনিটে 'আমার আছে জল' এর কিছু কাজ ছিল নুহাশপল্লীতে। ইনডোরের কাজ করার জন্যে হুমায়ূন বাইরের কোনো সেট ভাড়া নেন না। নুহাশপল্লীতে বানানো হয়েছে একটা বড় ঘর। সেখানেই সেট পাতা হয়।

এই সেটের কাজ শেষ হয়েছে।

২০০৮ সালের ৮ এপ্রিল মাজহার আমাকে ফোন করে বলল—স্যারের কাজ শেষ, আজ নুহাশপল্লী যাব, রাতে থাকব। অনেক মজার আড্ডা হবে। স্যার বলেছেন তোমাকেও নিয়ে যেতে। এই আমার রাজি হওয়া, আর প্রথম নুহাশপল্লীতে যাওয়া।

ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ রোড দিয়ে হোতাপাড়া পর্যন্ত গিয়েছি অনেকবার। মিডিয়ার পিকনিক, বন্ধুবান্ধবদের নাটক-সিরিয়ালের শুটিং, এসব কারণে। হোতাপাড়া গ্রামেই এক বৃদ্ধাশ্রমে শুটিংয়ের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু এই হোতাপাড়া মোড়টি পার হয়ে বাঁ দিকে সরু রাস্তা দিয়ে প্রায় ৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই নুহাশপল্লীতে যাওয়া যাবে।

নুহাশপল্লী নিয়ে এতদিন শুধু শুনেছি মাত্র। দেখার ইচ্ছা বা সুযোগ কোনোটাই হয় নি। যদিও ১৯৮৬ সাল থেকেই হুমায়ূন আহমেদের সাথে আমার ব্যক্তিগত জানাশুনার সূচনা, কিন্তু ২০০৮ সাল পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার সম্পর্কটা ছিল অনেক বেশি ফর্মাল। বিশেষ প্রয়োজনে যাওয়া আসা হয়েছে বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয় নি।

২০০৮ সালে *অন্যপ্রকাশ* থেকে প্রকাশিত একটি বই *(ক্লাস সেভেন ১৯৭৮)* আমাদের পুনর্মিলনী ঘটিয়ে দেয়। এর অনুঘটক হিসেবে কাজ করেন *অন্যপ্রকাশের* প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম। সে সবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে লেখা অপর একটি স্মৃতিচারণ গ্রন্থ 'হুমায়ূন আহমেদ : যে ছিল এক মুগ্ধকর'-এ। এখানে এসবের বিস্তৃতি আর দিতে চাই না।

ঢাকা থেকে রওয়ানা দিয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টার মাথায় আমরা অবশেষে নুহাশপল্লীতে পৌছে যাই। মাজহার বলে, হুমায়ূন আহমেদ তার নিজের চেষ্টায় এ গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেন, বাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং করা হয়ে গেছে। প্রায় সিকি কিলোমিটারের মতো পথ এখনো কাঁচা আছে। এখন কাঁচা পথটা যেরকম দেখছ, পিরুজালী বাজার থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার পথ এভাবেই ছিল।

রাতের অন্ধকারে আমরা নুহাশপল্লীতে গিয়ে পৌছি। দেখি, তাঁর নিজের পরিবারের লোকজনের বাইরে অভিনেতা জাহিদ হাসানও আছে। সম্ভবত কিছুদিন আগে সিলেটের কুলাউড়ায় করা 'আমার আছে জল' ছবির কিছু অংশ বাকি ছিল। এখানে করা হয়েছে। আজ শুটিং শেষ, সে চাইলে ঢাকা ফেরত যেতে পারত। কিন্তু তাকেও রেখে দেওয়া হয় আড্ডায় সহযোগী হওয়ার কারণে।

একটা একতলা পাকা ঘর তাঁর নিজের থাকার জন্য। চারটা বেডরুম, রান্নাঘর আর দু'দিকে কাঁচের স্বচ্ছ দেয়াল ঘেরা একটা বড় হলরুম। কিছুক্ষণ ওখানে বসেই আমরা চলে আসি ঘরের সামনের একটা গাছের তলায়। এ গাছের নাম জাপানি বট। খুব উঁচু নয়, তবে অনেক ডালপালা ছড়ানো।

গাছের গোড়াকে কেন্দ্র করে কংক্রিটের চওড়া গোলাকার বেঞ্চি। এখানে আরাম করে বসা যায়। কিন্তু তাতে কিঞ্চিৎ সমস্যা হয়, সবার মুখ দেখা যায় না। এক প্রায়-বৃদ্ধ লোক কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার নিয়ে এলেন। আমরা চেয়ারে, বেঞ্চিতে মিলে-মিশে বসি। নুরুল হক যেতে পারেন না। আমার সামনে তাকে নিয়ে আসা হলো। হুমায়ূন আহমেদ নূরুল হককে বসতে বললেন। পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৯৭ সালে যখন এই জমিটা আমি কিনি, তখন প্রথম দিন জমি চেনানোর জন্যে গ্রামের একটা

বাসভবন সংলগ্ন চত্ত্বর

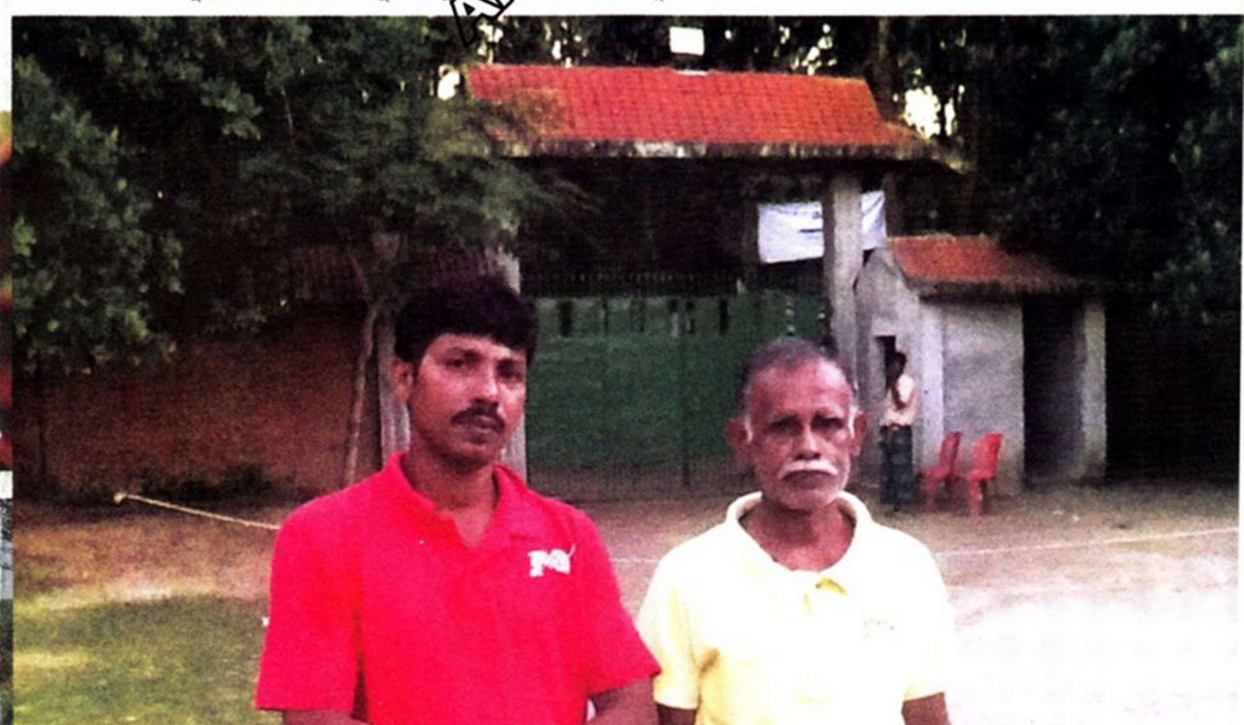


লোক আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিল। সে-ই জায়গাটা চেনায়। পরদিন দেখি দা-কোদাল নিয়ে এসেছে এই লোকটা, নিজের দায়িত্বে জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে লেগে যায়। আজ পর্যন্ত সে আছে। এই নুহাশপল্লীই তাঁর এখনকার ঠিকানা। এখানকার কেয়ারটেকার। অনেক সময় সাপের ভয়ে, ভূতের ভয়ে সব কর্মচারী নুহাশপল্লী ছেড়ে নিজেদের বাড়ি ঘরে চলে গেছে, নুরুল হক কখনো যায় নি। একদম একা, বিদ্যুৎ নাই, বাড়ি নাই, অন্ধকার, সাপ-খোপ-ভূত-পেত্নি নিয়ে সে এই নুহাশপল্লী পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। তালি।

নুরুল হক ভাইয়ের জন্যে জোরে তালি পড়ে। তালি শেষ হতেই আরেকটা গল্প শুরু করেন হুমায়ূন আহমেদ। গল্পটা তাঁর বিয়ের পর।

শাওনের দাদির খুব শখ হয়েছে, তাঁর নাতজামাইকে একটা রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়ে তাঁদের বাড়িতে নেওয়ার। শাওনের দাদার বাড়ি জামালপুরের নরুন্দিতে বিয়ের কয়েকমাস পর ছিল এ আয়োজন, ২০০৫ সালে। সংবর্ধনার অংশ হিসেবে আয়োজন ছিল হাতির। নরুন্দিতে ঢোকার সময় গেট বানানো হয়েছে হুমায়ূন আহমেদের নামে। এ গেট থেকে এক বৃহদাকার হাতি যাতে দুলহাকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে। অবস্থা বেগতিক দেখে হুমায়ূন আহমেদ নুরুল হককে মাথায় টুপি পরিয়ে, মুখে রুমাল দিয়ে [আমার মনে হয় রুমাল প্রসঙ্গটা স্যারের বানানো] হাতির পিঠে চড়িয়ে দিলেন। তখন সন্ধ্যা বেলা। মফস্বল শহরের লোকজন ভিড় করেছে হাতিকে কেন্দ্র করে। সবাই জেনে গেছেন হুমায়ূন আহমেদ বর বেশে হাতি সওয়ার হয়ে যাচ্ছেন শ্বশুরের বাপের বাড়ি। হাতির থেকে নিরাপদ দূরত্বে তাঁর পিছু পিছু তিনি হেঁটে যাচ্ছেন, কেউ তার দিকে তাকাচ্ছেও না। কেউ কেউ মন্তব্য করছে শুধু, জামাই শুনলাম বয়স্কলোক, কিন্তু এত বুড়া বলে তো শুনি নি।

নুহাশপল্লীর সবচেয়ে পুরনো দুই স্টাফ মোশাররফ ও নুরুল হক



হাসির রোল পড়ে গেল। নুরুল হক ভাইও হাসতে হাসতে চলে গেলেন ভেতরে।

ঘরের ভেতর ঢুকে, চলল খানাপিনার আয়োজন। খাওয়াদাওয়া শেষ। ঘুমানোর আয়োজন হবে। এমন সময় ম্যানেজার বুলবুলকে ডাকা হলো। বুলবুল নুরুল হক ভাইর ২/৩ বছর পরে জয়েন করেছেন নুহাশপল্লীতে। হুমায়ূন আহমেদের অবর্তমানে এই নুহাশপল্লীর মোটামুটি সর্বময় কর্তা বুলবুল। এখানকার ম্যানেজার। যাবতীয় কিছু বুলবুলের তত্ত্বাবধানে থাকে। সেই বুলবুলকে বলা হলো একটা টর্চলাইট নিয়ে আসতে।

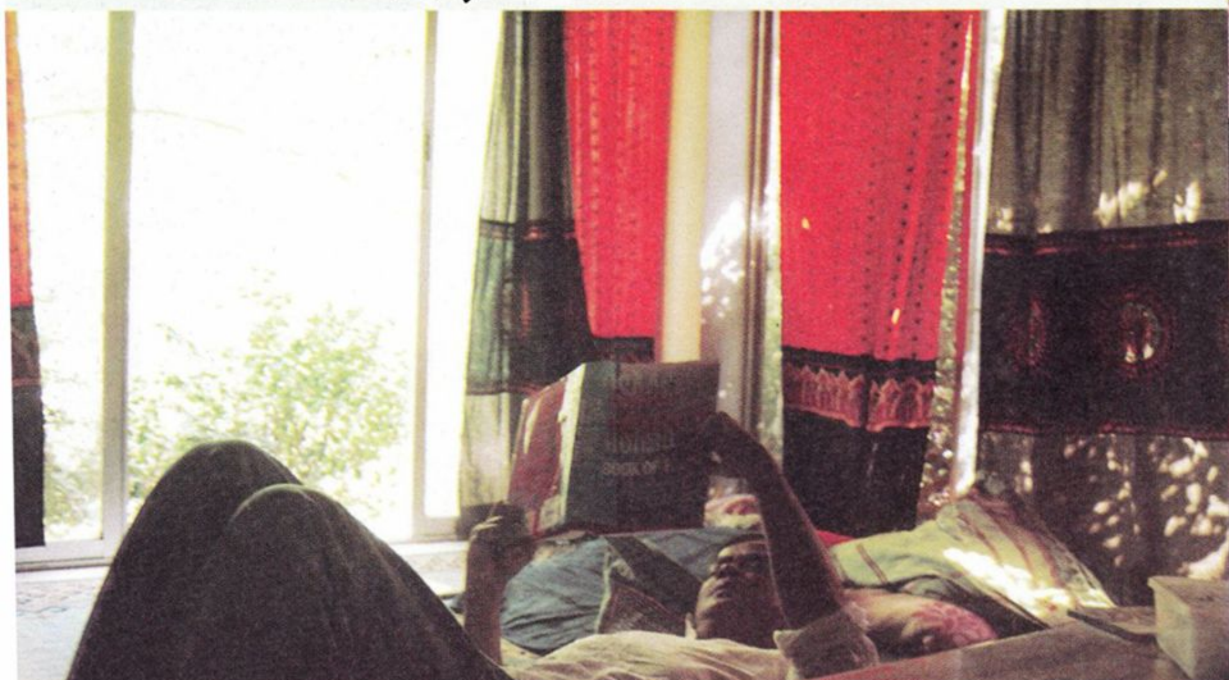
বুলবুল একটু উসখুস করছে। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকার।

বুলবুলের রেহাই নাই। টর্চ দাও, ছাতা বের করো। এই শাকুর, চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।

এ মুহূর্তে নুহাশপল্লীর একেবারে নতুন আমদানি আমি। বাদবাকি সবাই নুহাশের ঘাস-লতাপাতার সবকিছুই বহু বছর ধরে মুখস্থ করে রেখেছেন। আমি টের পেলাম, সবাই বেশ উসখুস করছেন। কিন্তু সাহস করে কেউই বলছেন না। আমার পক্ষে 'না' বলা তো একেবারেই অসম্ভব। কারণ, এ আয়োজনটা তো শুধু আমারই জন্যে।

আমি টের পাচ্ছি, আমার চোখে এক ধরনের মুগ্ধতার রেশ তিনি দেখতে চান। বছর কয়েক আগে একবার তাঁর 'দখিন হাওয়া'র বাসায় যেমন আমাকে কতকগুলো বিশালাকৃতির দামি পাথর দেখিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন, এটা নিশ্চয়ই সে রকমের কোনো আয়োজন।

নিজঘরের বৈঠকখানায় একান্তে হুমায়ূন আহমেদ



বাইরে বেরিয়ে দেখা গেল ছাতার প্রয়োজন নাই। যেটুকু বৃষ্টির ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে এটা বেশ মজার। আমাদের সিলেটি ভাষায় একে বলে 'ফিনফিনি' বৃষ্টি। আমরা এই ফিনফিনি বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যাই। আমাদের গাইড হুমায়ূন আহমেদ, তাঁর হাতে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চলাইট। লম্বা।

যেতে যেতে পথে পড়ে দু'তিনটে ভাস্কর্য। কোন ভাস্কর্যটা কে তাঁকে উপহার দিয়েছে, তার বর্ণনা। একসময় এক জায়গায় গিয়ে আমাদের গাইড থেমে যান। একটু এগিয়ে খানিক জঙ্গলের ভেতর গিয়ে একটা লাল রঙের আনারসের উপর টর্চের আলো স্থির করে রাখেন। বলেন, বলো—এটা কী ?

আনারস স্যার, লাল রঙের।

আরে গাধা, এটা হচ্ছে কেয়া। এর ফুল ফুটেছে, কেমন লাগল ?

চমৎকার।

স্যার হাসেন, বলেন ওটা আসলে কেয়া ফুল নয়। কেয়া গাছের পাতাগুলোর বিন্যাস। গাছের সবচেয়ে উপরের অংশে যেখান থেকে নতুন পাতা গজায় সেখানে চার-পাঁচ স্তরের পত্রমঞ্জুরী। প্রতিটি স্তরেই পাতাগুলো এমন চমৎকার একটা জ্যামিতিক বিন্যাস নিয়ে গজিয়েছে যে তা না দেখে বোঝানো যাবে না। আমি বললাম, স্যার আমি মুগ্ধ [স্যার এটি শুনতে চান, আমি জানি]।

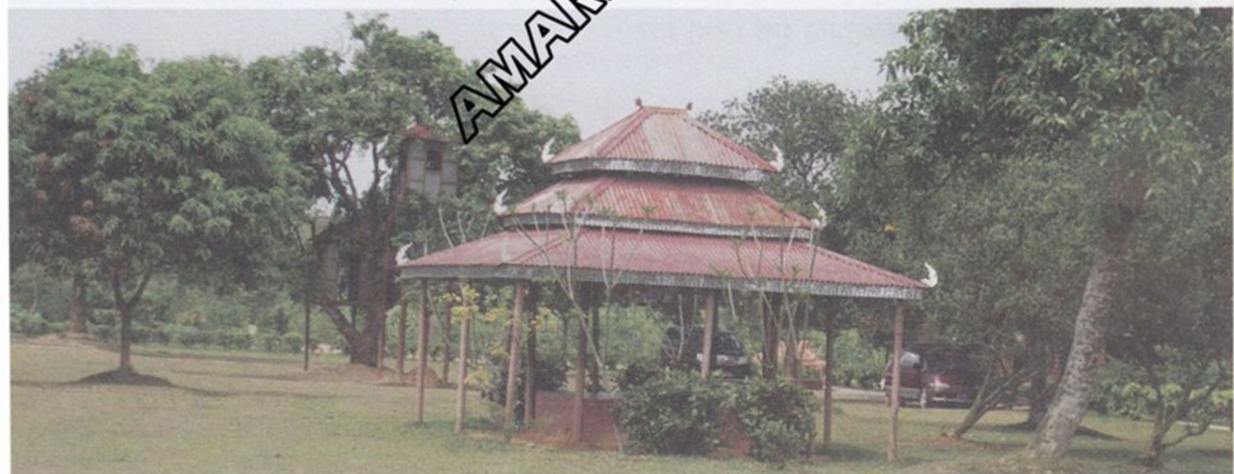
আমি টের পেলাম, তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আমার চেহারায় মুগ্ধতার প্রকাশ যেন খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, আমি কপালের ভাঁজরেখা বাড়িয়ে অনেকক্ষণ এই ফুলগাছের দিকে চেয়ে থাকি, যতক্ষণ এই অন্ধকারেও টর্চের সামান্য আলোকবিভাসে আমার মুখ দেখা যায়।

একতলা এই বাড়িটি বানানো হয় ২০০০ সালের শেষ দিকে



বাড়ির পাশে উন্মুক্ত বৈঠকখানা

নুহাশপল্লীর ট্রি হাউস ও প্যাগোডা আকৃতির ছাউনি



নুহাশপল্লীর চত্বর। মাঝখানে মার্বেল পাথরে বাঁধানো উন্মুক্ত নামাজ পড়ার জায়গা



নুহাশপল্লী ট্র্যাজেডি : নয় নম্বর বিপদ সংকেত

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একা একা ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। রাতের অন্ধকারে নুহাশপল্লীর তেমন কিছুই দেখা হয় নি। এবার মনে হলো—হুমায়ূনের বহু নাটক সিনেমায় দেখা এই চত্বরটি আমার বেশ পরিচিত।

নুহাশপল্লীর গেট আটকানো। এ গেট দিয়ে ভেতরে কেউ ঢুকতে পারে না। সিনেমার ইউনিটের লোকগুলো আছে 'বৃষ্টিবিলাস' নামক একটা ঘরে। 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'-এর সোবহান সাহেবের বাড়ি।

এ ঘরটির ডিজাইন ব্রিটিশ আমলে সিলেটের চা-বাগানগুলোতে ইংরেজ সাহেবরা যে সকল বাংলোবাড়ি বানিয়েছিলেন, তাদের ডিজাইনের অনুকরণে। সামনে তিনদিক খোলা প্রশস্ত বৈঠকখানা, তার পেছনে প্রশস্ত টানা বারান্দা, তার পেছনে ঘর। উপরে টিনের ছাদ। টিনের তলা দিয়ে নকশাদার কাঠের প্যানেলিং। এ কাজগুলো সিলেটের বাড়িতে একসময় হতো। মূলত আসাম অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত বাড়িগুলোতে এ রকম নকশার আয়োজন ছিল দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত। সিলেট থেকে এগুলো উঠে গেছে, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের প্রথম শৈশবের দিনগুলো এখানেই কেটেছিল বলেই হয়তো এই অঞ্চলের স্মৃতিমাখা একটা ঘর বানিয়েছেন। সিলেট বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চল। টিনের চালে বৃষ্টির রিনিঝিনি শুনবেন বলেই হয়তো এমনটি বানানো। একসময় বৃষ্টি বাদলার দিনে তিনি এ ঘরে থাকতেন। এখন থাকেন না। কিন্তু নাম রয়ে গেছে। নাটক-সিনেমার ক্রুরা এখানে থাকতে পারেন। ছোটবড় মিলে ১০টি কামরা আছে এখানে।

তার সামনেই গাছের উপর একটা বাড়ি। ট্রি হাউজ! এ রকম ট্রি হাউজের সন্ধান পেয়েছিলাম চীনের শিশুয়ানবান্নায়। ওয়া উপজাতীয় জংবাজ চীনারা ষাঁড়ের পূজারী এবং তারা গাছের উপর ঘর বানিয়ে থাকে। অনেক খুঁজেও একটা গাছবাড়ি খুঁজে পেলাম না। আমাকে একটা জাদুঘরে নিয়ে গিয়ে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি দেখানো হলো। হুমায়ূন আহমেদেরও হয়তো কখনো এমন গাছ ঘরে বসে বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই বানিয়েছিলেন। তিনি নিজে যা করতে পারেন না, তাঁর উপন্যাসের বা সিনেমার চরিত্র সেটা করে। যেমন হিমু।

কিছুদিন আগে তাঁর সর্বশেষ ছবিটি দেখেছিলাম টেলিভিশনে। ছবির নাম *'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'*। এ ছবিটিতে হাবাগোবা, বইপড়ুয়া একটি তরুণের চরিত্র



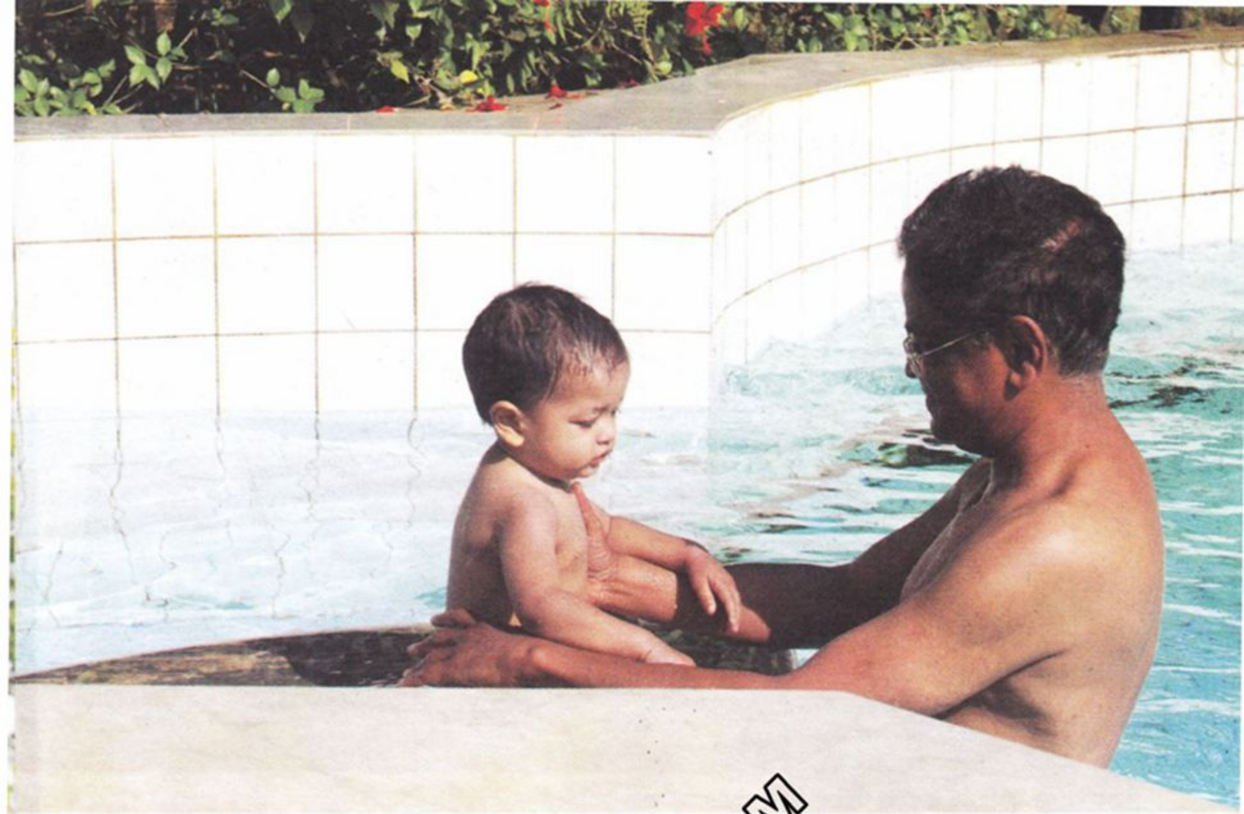
নুহাশপল্লীর সুইমিংপুল

আছে, যে মুরগির খোপের মতো এই বৃক্ষবাড়িতে বসে বসে বই পড়তো। পরিবারের কোনো বড় অঘটনও তাকে স্পর্শ করতো না।

নুহাশপল্লী সম্পর্কে আমার একটা ধারণাই হয়ে গিয়েছিল এই 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত' ছবিটি দেখে। বারবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, সম্পূর্ণ নুহাশপল্লীতে চিত্রায়িত এই ছবি। একসময় সিনেমার বিজ্ঞাপনে শুনতাম 'সম্পূর্ণ ব্যাংককে' বা 'সম্পূর্ণ নেপালে' চিত্রায়িত। এখন এটা চলে এসেছে দেশের বাগান বাড়িতে।

ইদানীং সিনেমাহলে গিয়ে আমাদের সিনেমা দেখার দরকার পড়ে না। শুধু পুরাতন সিনেমাই নয়, নতুন নতুন ছবিও এখন টেলিভিশনে প্রিমিয়ার হয়। ধন্যবাদ ফরিদুর রেজা সাগরকে। বেডরুমে শুয়ে শুয়ে নতুন সিনেমা দেখার এই মহান সুযোগটি তিনি করে দিয়েছেন বাংলাদেশের দর্শকদের জন্যে। 'হঠাৎ বৃষ্টি' দিয়ে শুরু, তারপর চলছে। তিনি পথ দেখিয়েছেন, বাকিরা তাঁর দেখানো পথেই হাঁটছে। আমাদের কত আনন্দ। আমরা হুমায়ূন আহমেদের *'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'* দেখি ঘরে বসে।

২০০৭ সালে মুক্তি পাওয়া এ ছবিটি বেশিক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করে নি আমার। মূলত তাঁর নুহাশপল্লীকে দেখার জন্যই ছবিটি সম্পূর্ণ দেখা। এবং ছবি দেখতে দেখতে আমি টের পেলাম, এ ছবিটায়ও কি লেখক তাঁর নিজের গল্প বলেছেন?



শিশুপুত্র নিষাদের সঙ্গে সুইমিংপুলে হুমায়ূন আহমেদ

রহমত আলী (সোবহান সাহেব) একজন বিত্তবান প্রৌঢ়। তিনি শহরের বাইরে একটা বিশাল বাগানবাড়ি বানিয়ে চাকর-বাকরদের নিয়ে থাকেন। কোনো এক অজানা কারণে তার পুত্র-কন্যারা তার কাছে আসে না। বাবার মন সব সময় তাঁর পুত্রকন্যাদের জন্যে ব্যাকুল। একসময় তার মনে হলো যে, জীবিত অবস্থায় আমাকে দেখতে আসছে না ঠিক, কিন্তু আমার মৃত্যুর পর তারা নিশ্চয়ই আসবে আমার লাশ দেখতে। কিন্তু সে সময় তো তিনি তাদের দেখতে পাবেন না।

এই চিন্তা থেকে বাড়ির ম্যানেজার (জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়) একটা নাটকীয় দৃশ্য সাজান। তারা তার সন্তানদের জানায় যে, তিনি মারা গেছেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ হয়। একটা কফিনের ভেতর ঢুকিয়ে রাখা হয় রহমত আলীকে। ভাড়া করা মৌলভিরা এসে দোয়া পড়তে থাকেন। একে একে তার দুই কন্যা ও এক পুত্র এসে হাজির হয় মরা বাবাকে দেখতে। আসার পর শুরু হয় নানা রকমের ক্যারিকেচার।

ছবিটি আমার মোটেই ভালো লাগে নি। তবে কয়েকটি গান ভালো লেগেছে। 'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে/... কিছুতে কেন যে ভালো লাগে না'।

রবীন্দ্রনাথের গান, শাওনের গলায় গাওয়া এবং তানিয়া আহমেদের খুব সুন্দর কোরিওগ্রাফিতে উপস্থাপনা। নুহাশপল্লী বৃষ্টি বাদলায় কী চমৎকার রূপ নেয়, এ গানটা না দেখলে বোঝা যাবে না। আমি নিশ্চিত, নুহাশপল্লী কোনো বাদলেই এমন



সিলেটের চা-বাগানের বাঙলো বাড়ির আদলে বানানো বাড়ি 'বৃষ্টিবিলাস'

রূপ পায় নি, এ রূপটা হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টি করা। সিনেমায় বৃষ্টিবাদলা তৈরি করার অনেক যন্ত্রপাতি এফডিসিতে আছে, ভাড়াও পাওয়া যায়।

নয় নম্বর বিপদ সংকেতের অন্য গানগুলোও ভালো লেগেছে। হুমায়ূন আহমেদ নিজেই তাঁর ছবির জন্যে গান লিখেন। কোনো জীবিত গীতিকারের সুযোগ নাই তাঁর ছবির জন্যে গান লিখতে। এর আগে বিভিন্ন ছবিতে তিনি হাছন রাজা, রবীন্দ্রনাথ, রশিদ উদ্দিন, উকিল মুন্সি এসব মৃত গীতিকারদের লেখা গান ব্যবহার করেছেন। এ ছবির একটা রোমান্টিক গান–

'...তোমাকে বলব, হ্যালো মিস্টার, খবর শুনেছো নাকি
তোমার আমার প্রণয় নিয়ে দেশজুড়ে মাতামাতি
ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে তোমার আমার পোস্টার
সব পত্রিকায় ফ্রন্টপেজে ছবি তোমার এবং আমার।'

আরেকটা কাওয়ালি গান লিখেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। বাংলা-হিন্দি [বা উর্দু] মিলিয়ে। কাওয়ালি আসরে গান গাইছেন তানিয়া, পুরুষ ও মহিলার গলায়। পুরুষের গলা এসআই টুটুলের, মহিলার কণ্ঠ শাওনের। গানের কথাগুলো এমন–

পুরুষ : মজনু কাঁদিয়া কয়, লাইলী তুম কাহা
ফাগুন রজনী ফুরায় যায়
মহিলা : লাইলী হাসিয়া কয়, মজনু হাম ইয়াহা
কিউ তুমহারা ইতনা হায় হায়



গ্রামের বাড়ির আদলে বানানো এই বাড়িটি ব্যবহার হতো মূলত শুটিংয়ের কাজে

গানের ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের পর বাংলার লোকগীতিকেই সব সময় প্রাধান্য দিয়েছেন। সবার আগে দিয়েছেন 'হলুদিয়া পাখি, সোনালী বরণ' গানটি। রশিদ উদ্দিনের লেখা এ গানটি আবদুল আলীমের গাওয়া ছিল। এরপর হাছন রাজা এসে ভর করেছিলেন হুমায়ূনের উপর। এ নির্ভরতা থেকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। নিজের ভেতর একজন হাছন রাজাকেও তিনি লালন করতেন। হাছনের ছিল দেখার হাওড়, বজরা নাও, কুড়া শিকার, জ্যোৎস্নাবিলাস। হুমায়ূনও তাঁর রাজত্ব গড়ে তোলেন ৪০ বিঘার সাম্রাজ্য নুহাশপল্লী।

এ সিনেমাটি নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ সম্ভবত নিজেই খুব সিরিয়াস ছিলেন না। তাঁর নুহাশপল্লীকে অবলম্বন করে বানাবেন বলেই হয়তো এমন পরিকল্পনা নিয়ে বানানো। তা না হলে সিনেমার টাইটেলে কেন তিনি লিখবেন 'হুমায়ূন আহমেদের একটি অর্থহীন ছবি'। মজার কথা—এর শেষ দৃশ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনেতা রহমত আলীকেও বলতে শোনা যায় এমন কথা যে, 'ছবি দেখে ভালো লাগলে লাগল, না লাগলে নাই, আমাদের ছবি এখানেই শেষ।'

তবে এ ছবির কাহিনিটি তাঁর ব্যক্তিজীবনেই আবার ঘটে যায় কিনা, এ নিয়ে মানুষের উৎসাহের শেষ নাই। আমারও অনেক কৌতূহল। দেখি না, কী হয়!

নিজহাতে রোপন করা গাছ-গাছালির সাথে
অভ্যাগতদের পরিচয় করিয়ে দিতে পছন্দ করতেন

গাইডেড ট্যুর

একসঙ্গে সবার নাস্তা খাওয়া শেষ হলে আমি ঢাকা ফেরার জন্যে আওয়াজ দেই মাজহারকে। মাজহার চোখের ইশারায় আমাকে শান্ত হতে বলে। আঙুলের ইশারায় স্যারকে দেখায়। এর মানে হচ্ছে, স্যারের কিছু মতলব আছে, এখনই উঠা যাচ্ছে না।

ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি বিশাল আকৃতির একটা চৌকোনা ছাতা টাঙিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মোস্তফা। মোস্তফা হুমায়ূন আহমেদের গৃহ-সহকারী। তার প্রধানতম কাজ তার শিশুপুত্র নিষাদকে দেখে রাখা এবং তাঁরা যেখানেই যাবেন তাঁদের সঙ্গে থাকা।

ছাতা দেখেছি গোলাকার। অনেক বড় ছাতাও দেখেছি ট্রাফিক পুলিশ বা সমুদ্র সৈকতে। কিন্তু এমন চারকোনা, বর্গাকৃতির ছাতা দেখা হয় নি। এ ছাতার নিচে একসঙ্গে ৬-৭ জন আরাম করে হাঁটতে পারেন। হাঁটার সময় মনে হবে, মাথার উপর একটা ছাদও হাঁটছে।

হুমায়ূন আহমেদ ঘরের বাইরের গাছটি দেখিয়ে বলেন, এটা হচ্ছে ছাতিমগাছ। নাম শুনেছ ? আমি বলি, শুনেছি এবং দেখেওছি।

কোথায় ?

শান্তিনিকেতনে। একবার রবীন্দ্রনাথের বাবা বোলপুর হয়ে তাঁর গুরুজীর আশ্রমে যাওয়ার পথে দু'টো ছাতিমগাছের নিচে বসেছিলেন। তখন তাঁর মনে কী ভাবের উদয় হয়েছিল সেটা এখনো ওই দুই ছাতিমগাছের তলায় বাঁধাই করে রাখা আছে। আমি শান্তিনিকেতনের উপর ডকুমেন্টারি বানিয়েছি, আমার কাছে ফুটেজ আছে। আপনি চাইলে দেখাতে পারি।

মনে হলো—স্যার আমার কথায় বেশ মুগ্ধ। আমি বলি, স্যার এটার ইংরেজি নাম কী ? আমি ইংলিশ ভার্সন করার সময় অনেক কষ্টেও এর ইংরেজি নাম যোগাড় করতে পারি নি।

ডেভিলস ট্রি।

স্যার ?

শয়তানের গাছ। এটাই এর ইংরেজি নাম। কেন এটার এই ইংরেজি নাম, আমি জানি না। তবে ডালগুলো ছাতার মতো হয় বলে বাংলায় এটা ছাতিম হয়েছে এটা বলতে পারি। তুমি শান্তিনিকেতনের সূচনাতে দু'টো ছাতিমগাছের কথা বলছো, এই দেখো, আমার মেইন বিল্ডিং-এর সামনেও দু'টো ছাতিমগাছ। আসো, আরও অনেক কিছু দেখার আছে।

দলবল নিয়ে বাগান বিহারে বেরোন হুমায়ূন আহমেদ। আমি মোটামুটি নিশ্চিত, আমি ছাড়া বাদ বাকি সবাই মনে মনে খুবই বিরক্ত। বাগান তারা বহুবার দেখেছেন, তারপরও আসতে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে।

এই দেখো, এর নাম 'বৃষ্টিবিলাস', তোমাদের সিলেট অঞ্চলের স্টাইলে বানানো বাড়ি।

জি স্যার, জানি। সিনেমায়ও দেখেছি।

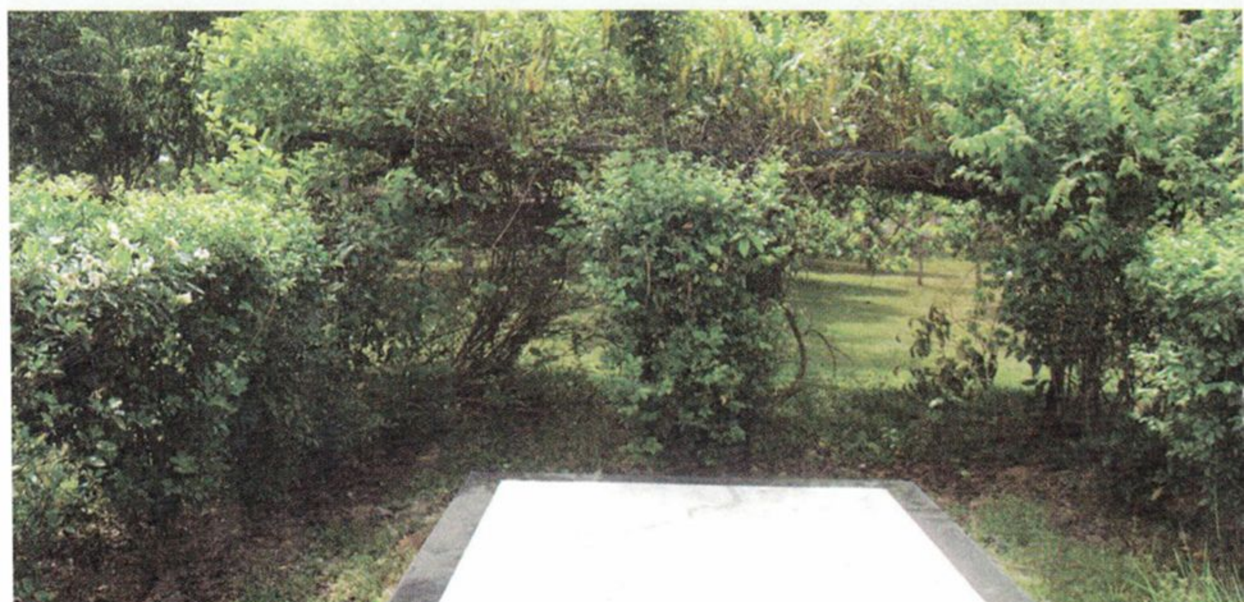
ওই দেখো, গাছের উপর বাসা। ট্রি হাউজ।

ওটাও সিনেমায় দেখেছি স্যার। আপনার সিনেমায় এক যুবককে ওই খুপরির ভেতর বসে বই পড়তে দেখেছি। আপনি নিজে কখনো ওই গাছের উপরের ঘরে বসে বই পড়েছেন?

[মাথা চুলকাতে চুলকাতে] এখনো পড়া হয় নি। ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে। চলো, সামনে যাই।

এর সামনেই একটা প্যাগোডা ধরনের স্ট্রাকচার। নিচতলাটা চারদিকে খোলা। উপরে তিন স্তরের টিনের ঢালু ছাদ। এটা হলো বৌদ্ধদের উপাসনার আশ্রম। যে-কোনো সময় ভিক্ষুরা এসে গেলেই প্রার্থনায় বসে যেতে পারেন। চীনে এ ধরনের অনেক স্থাপনা দেখেছি। এমনকি চীনা প্যাগোডাগুলোতে কোনার দিকে জয়েন্টে

চত্বরের মাঝখানের এই জায়গাটি নামাজ পড়ার জন্য বানানো



আকাশমুখী একটা ড্রাগনের বিমূর্ত রূপ যেমন থাকে, এখানেও তা-ই। জিজ্ঞেস করি, এটা কেন স্যার?

হুমায়ূন আহমেদ বলেন, আমার ইচ্ছা হলো চৌচালা একটা টিনের ঘর থাকবে এখানে একটু অন্য রকম। এজন্যেই বানানো। প্যাগোডার বিষয়টা মাথায় আসে নি। কিন্তু টিনের চালার নিচের অংশের কাজটুকু দেখো, চিনতে পারছো? তোমাদের সিলেটি টিনের বাড়ি না?

বৃষ্টিবিলাসের সামনে আরও দুটো চারচালা টিনের ছাউনি। ছাউনির নিচে একই নকশার টিনের টুকরার কারুকাজ। এ চালা দুটোর নিচে দোলনা। দোলনার দোলায়মান বেঞ্চিতে ২/৩ জন বসা যায় এমন। বৃষ্টির দিনে কারও যদি বৃষ্টির রিনিঝিনি শুনে দোল খেতে ইচ্ছা করে, তাদের জন্যে এই আয়োজন। বাহ! আমি মাথা ঝাঁকাই। আসলেই তাই।

মাঠের মাঝখানের একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের। এখানে মার্বেল পাথরের একটা প্লাটফর্ম। সাদা পাথরের চারপাশে কালো মার্বেলের বর্ডার। মাটি থেকে ফুট খানেক উঁচু। এর তিন দিক ফুলের গাছ দিয়ে ঢাকা। হুমায়ূন আহমেদ বলেন, এটা বানিয়েছি আমার মা'র জন্যে। তিনি যখন নুহাশপল্লীতে আসবেন, তখন এখানে বসে নামাজ পড়বেন। চারপাশ থেকে ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করবে এই নামাজের জায়গা। ভয় নাই, ফুলের গন্ধে যাতে সাপ না আসে তার ব্যবস্থা আছে। কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ানো আছে চারদিকে। কিছুদিন পরপরই এই পাউডার ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

আগের দিনে সিলেটের বাড়িগুলোর টিনের ছাদের নিচে কার্নিশের দিকে খাঁজকাটা টিনের টুকরো দিয়ে যে নকশার কাজ করা হতো, এখানেও তাই।

সঙ্গীদের নিয়ে গাইডেড ট্যুরে হুমায়ূন আহমেদ



আমরা হাঁটতে থাকি তাঁর বোটানিক্যাল গার্ডেনের মাঝ দিয়ে। মাঠের এক কোনায় বেশ কয়েকটি ছোট ছোট গাছ। একই আকারের গাছগুলো আমার চেনা। হুমায়ূন আহমেদ বলেন, এটা চা-বাগান। পছন্দ হয়েছে ? সিলেটের বাগান নিয়ে এসেছি নুহাশপল্লীতে।

এ বাগানের চা গাছগুলো থেকে কখনো চা উৎপাদন করা হয় নি। চা উৎপাদন আরেকটি জটিল প্রক্রিয়া। এ গাছগুলো এসেছে সিলেটের স্মৃতি আর বাগানের বৈচিত্র্য আনার জন্যে।

মজার ব্যাপার, এর উল্টোপাশেই একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, চেন নাকি ? বলো তো ওটা কিসের গাছ ?

আমার উত্তর মুখস্থ। সাতকরা [গাছের নিচে ছোট সাইনবোর্ড লেখা আছে 'সাতকড়া']। আমি প্রচুর সাতকরা খাই, কিন্তু গাছ দেখি নি কখনো। এত সহজে গাছ দেখা হয়ে যাবে, ভাবি নি। জিগ্যেস করি,

স্যার, সাতকরা কি আপনার পছন্দ ?

খুব। কিন্তু পাব কই ? আমার গাছে এখনো সাতকরা ধরে নি। তবে সিলেটের আরজু ঢাকা এলে আমার জন্য সাতকরা দিয়ে গরুর মাংস রান্না করে আনে।

এর পাশেই দেখি, কাল রাতে দেখা সেই 'কেয়া' ফুলের গাছ। অবিকল আনারসেরই মতো তার পাতা। কিন্তু ওখানে নাকি আনারস ধরে না। গাছের পাতাগুলো এমন বেশ ধরে থাকে যে দেখতে আনারসের মতোই লাগে। আমি পাগল হয়ে যাই এই আনারসের ছবি তোলার জন্যে।

বৃষ্টিবিলাসও প্যাগোডা ছাউনিতে ব্যবহৃত [illegible] কাঠের কারুকাজ



হুমায়ূন আহমেদ কতকগুলো ফুলের গাছের কাছে নিয়ে যান। যেগুলোর নাম দেখতে পাওয়া যায়, তার নাম বলতে পারি। নাম না দেখা গেলে আমার সরল উত্তর —স্যার, আমি গাছ-লতা-পাতা-ফুল চিনি না—দুই চারটা ছাড়া।

তিনি বলেন, তুমি কি জান রবীন্দ্রনাথ অন্তত চারটা ফুলের নাম রেখেছিলেন ?

আমার সঙ্গে আর যারা আছে, সবাই চুপ। কারণ, সবাই এগুলোর কথা আগে শুনেছেন। আমি শুনি নি। একজন মাত্র মুগ্ধ ছাত্রকে পেয়ে বোটানির শিক্ষকের যেন আনন্দ ধরে না।

একটি ফুলের গাছের কাছে গিয়ে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজা উদয় সিংহের বাড়িতে একটা ফুলগাছের বাংলা নাম না দেখে তাৎক্ষণিকভাবে নাম রাখেন —'উদয়পদ্ম'। এরপর থেকে এ ফুলের এই নাম হয়।

নীল রঙের পাতাওয়ালা আরেকটি গাছ দেখিয়ে বলেন, এর নাম 'নীলমণি লতা'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা মাধুরীর স্মৃতিতে একটা গাছের নাম রেখেছিলেন— 'মাধুরীলতা'। তবে মাধবীলতা নয়, অনেকে মাধবীলতার সঙ্গে এটা গুলিয়ে ফেলে।

বুগেনভিলিয়া আমি চিনি। এর বাংলা নাম যে 'বাগানবিলাস' এটাও আমার জানা। কিন্তু এটা যে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম—এটা জানতাম না।

নুহাশপল্লীর এই বোটানিক্যাল গার্ডেনের সামনে একটা বড় সাইনবোর্ড। তাতে লেখা—'নুহাশপল্লী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ওষুধি বৃক্ষের উদ্যান'। তার নিচে মহর্ষি চরককে উদ্ধৃত করে লেখা একটা বাণী—'যার জন্ম যেখানে, তার ভেষজও সেখানে জন্মগ্রহণ করে।'



আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক চার হাজার বছর আগে যে বাণী দিয়ে গিয়েছিলেন—নুহাশপল্লীর মালিক এ বাণীটিকে বড় করে সেঁটে রেখেছেন তাঁর উদ্যানে এবং এই কথাকে কেন্দ্র করে বেশ কতকগুলো গাছ দেখালেন, বললেন কোন গাছ কী কাজে লাগে। এই বাগানে যে সকল ওষুধি বৃক্ষ লাগানো আছে তার তালিকাটা মোটামুটি এ রকম—দণ্ডকলস, হাতিশুঁড়, বিষকাটালী, অগ্নিশ্বর, ভেরেণ্ডা, চিকরাশী, পান, শিয়ালমুর্তা, জয়ত্রি, আপাং, চালধোয়া, শ্বেতচন্দন, কল্পনাদ, কষ্টকারী, রক্তজবা, ওলটকম্বল, ধুতরা, বাসক, কর্পূর, আগর, রিঠা, পানবিলাস, নিশিন্দা, সর্পগন্ধা, অর্জুন, পুদিনা, তুলসি, আমলকী, নয়নতারা, রক্তকরবী, যজ্ঞডুমুর, গন্ধভাদালী, টগর, জয়তন, বেত, মহুয়া, মেহেদি, কুমারিয়ালতা, বহেড়া, হরীতকী, দাদমর্দন, গিলা, গুলঞ্চ, ঝুমকোলতা, জয়ন্তী, তেলমাখনা, কলকে, সন্ধ্যামালতি ইত্যাদি।

হুমায়ূন আহমেদ একটা আদাগাছ দেখিয়ে বলেন, সর্দি জ্বরে আদার রসে মধু লাগিয়ে খেলে প্যারাসিটামল খাওয়ার দরকার হবে না। আর ওই যে কদমগাছ, এটা চিবিয়ে আদিবাসীরা নেশা করতো। তবে টিউমার, কৃমি, শিশুদের মুখে ঘা এসবের ঔষধ হিসেবে এর ব্যবহার আছে।

একটা ধানপাতার মতো গাছ দেখিয়ে বললেন, এটা হচ্ছে গাঁজা, নুহাশপল্লীতেও গাঁজার চাষ হয়। বলেই হাসলেন। এটা লাগিয়েছি সুনীলের স্মরণে। একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নুহাশপল্লীর গাছপালা দেখে বললেন, তোমার এখানে গাঁজার গাছ নাই?

আরেকবার এলে দেখাব এই বার আপনার গাঁজা গাছ।

আর এটা হচ্ছে পান গাছ, তোমার নিশ্চয়ই খুব প্রিয়। এখন থেকে নুহাশপল্লীতে এলে শুধু সুপারি নিয়ে আসবে, এ গাছ থেকে পান পেড়ে খাবে, ঠিক আছে?

বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখাতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতেন হুমায়ূন আহমেদ









তিনি একটা পানপাতা ছিঁড়েন। বলেন, দেখো, এর সাতটা শিরা। আয়ুর্বেদ ডাক্তাররা বলেন, এর মধ্যমটায় বিষ আছে। আমি মেনে নিই। আমার দাদি-নানিকে দেখেছি, পানপাতা হাতে নিয়ে মাঝখানের শিরাটি ফেলে দিচ্ছেন—তারাও কি আয়ুর্বেদ ডাক্তারদের কথা শুনেছিলেন ? কে জানে!

আরেকটা গাছের পাশে গিয়ে বললেন, বলো, এটার নাম কী ? এটা থেকে অনেক মূল্যবান সুগন্ধী হয়। আমি প্রশ্নের পরের অংশটি শুনে আন্দাজ করে বলে ফেললাম—এটা আগর গাছ।

উত্তর সঠিক। দশে দশ। সিলেটের বড়লেখা এবং আমাদের বিয়ানিবাজারের জলঢুপ পাহাড়ি অঞ্চলে অনেকেই এই গাছ চাষ করেন। একেকটা গাছ নাকি লাখ টাকায়ও বিক্রি হয়। আগর রপ্তানি হয় মধ্যপ্রাচ্যে। আরবরা এর বাকল থেকে তৈরি হওয়া ধূপ সুঘ্রাণ হিসেবে ব্যবহার করে।

আরেকটা গাছের পাতা ছিঁড়তে বলেন সবাইকে। কেউ ছিঁড়ল না, আমাকেই ছিঁড়তে হলো। স্যার বলেন, এবার হাতের তালুতে এটা ঘষো। আমি ঘষলাম। আমার সঙ্গে বাকি যারা আছেন, সবাই হাসছেন। এবার স্যারের নির্দেশ—ওটা নাকের কাছে নাও, গন্ধটা শুঁকো।

আমি গন্ধ শুঁকতে গিয়ে টের পেলাম। কিসের গন্ধ—তা বলা যাবে না। সবার হাসির মাত্রা বেড়ে গেছে। আমি বলি—স্যার, হাত ধোবো, পানি আনান। স্যার হাসেন। পানি লাগবে না, হাত শুকিয়ে গেলে অমন মিষ্টি ঘ্রাণ আর থাকবে না।

এবার কুচ ফল দেখানো হয়। এর বীজ বের করে দেখি লাল রঙের। কিন্তু কালো একটা বিন্দু আছে বীজের মধ্যে। আমাদের আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ বলেন, এটা খুবই বিষাক্ত বীজ। অর্ধেকটা বীজ খেলে গরু বা ঘোড়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। মানুষের ব্যাপারটা জানি না। তবে গ্রামবাংলায় মহিলাদের গর্ভপাতে এ গাছের বীজ ব্যবহার হতো।

ঔষধি বৃক্ষের উদ্যানের সাইন বোর্ড





নুহাশপল্লীর সদর দরজার পাশে মাতা-পুত্রের রহস্যময় ভাস্কর্য

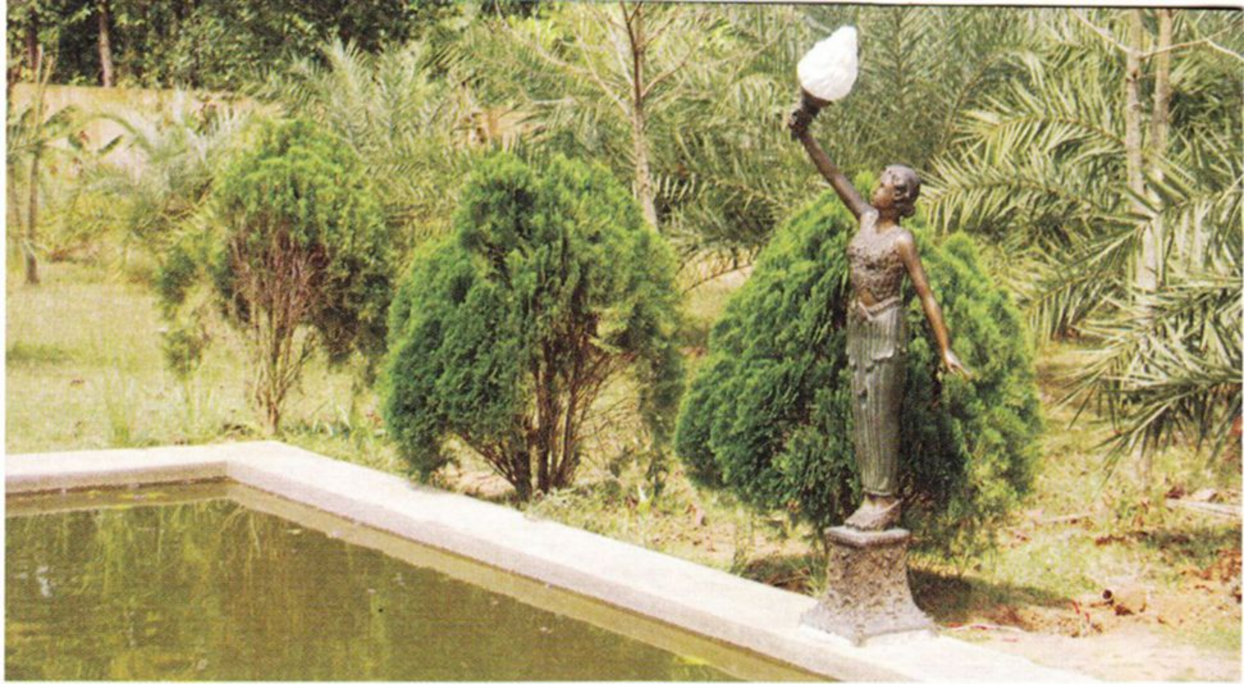
তাঁর ভাস্কর্যপ্রীতি

নুহাশপল্লীর ঔষধি বৃক্ষের বাগান দেখতে গিয়ে মনে হলো, এটা একটা টিলার উপর। তার কারণ, এখান থেকে ধীরে ধীরে ঢালু বেয়ে নিচে নেমে গেছে। কোথাও সিঁড়ি, কোথাও ঢালু পিচঢালা পথ। অনেক সাবধানে নামতে হয় নিচে। আমার অবশ্য সে সংকট হয় নি। কারণ, বামদিকে একটা গ্রামীণ পরিবেশের বাড়ি বানিয়ে রাখা, বোঝাই যাচ্ছে, কেবলমাত্র শুটিংয়ের জন্য এ বাড়ির ব্যবহার হয়। ডানপাশে উদ্যানের অপর অংশ। এখানে নানা রকমের ভাস্কর্য। পিকনিক স্পটগুলোতে যেমন থাকে, অনেকটা সে রকম। এক মৎস্যকুমারীর ভাস্কর্য আছে একটা শানবাঁধানো গোলাকার বড় চৌবাচ্চার মধ্যে। তার মুখের অংশ নারী, নিচের অংশ মাছ। মৎস্যকুমারীর একটু উপরে টিলার উপর এক দানবের মূর্তি। উপরের অংশে মুখ। তারপর নিচে এসে হাতের আঙুল উঠে এসেছে। যেন মাটির তলায় দুই হাত আর মুখ বের করে আছে দানব। তার ডাকে এই জলাশয় থেকে উঠে এসেছে মৎস্যকুমারী। রূপকথার সেই গল্পের ভাস্কর্যিক রূপ।

এই মৎস্যকুমারীর থেকে একটু দূরে হুমায়ূন আহমেদের একটি আবক্ষমূর্তি। তাঁর একনিষ্ঠ প্রকাশক *অন্যপ্রকাশ* ২০০[illegible] সালে তাঁর জন্মদিনের উপহার হিসেবে এই মূর্তিটি পাঠিয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদ একে বসালেন এখানে। নিজের ছবি দেখে রসিকতা করতে ছাড়েন না তিনি। বলেন, ওরা বলে এটা নাকি আমার ছবি। আমি কি এত নাক বোঁচা ? দেখো, নিচে আবার লিখে রেখেছে, 'বৃক্ষপ্রেমী হুমায়ূন আহমেদ'।

নুহাশপল্লীর ঢালু টিলার নিচের সমতল জায়গায় কতকগুলো দোলনা বসিয়ে রাখা। পিকনিক পার্টিরা এ জায়গাটি ব্যবহার করেন। পিকনিকের মৌসুমে ভাড়া হয় এ স্পট। দিনপ্রতি ২৫ হাজার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে ৫ হাজার ছাড়। শুক্র ও শনিবার ৫০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য দিন ৪০ হাজার টাকা।

এই পিকনিক স্পটের জন্যেও কয়েকটা ভাস্কর্য বানিয়ে রাখা আছে। কংক্রিটের স্ট্রাকচারে বানানো হয়েছে ডায়নোসার! তাদের একটি টি-রেক্স। এ রকম ৪টা ডায়নোসার আছে এখানে। এগুলো ছাড়াও নুহাশপল্লীর ঔষধি বৃক্ষের উদ্যানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরও কতকগুলো ভাস্কর্য। দারুচিনি গাছের আড়ালে কালিমূর্তি। দেবী কালি জিহ্বা বের করে আছেন। সামনে পিছে তার বারোটা হাত।



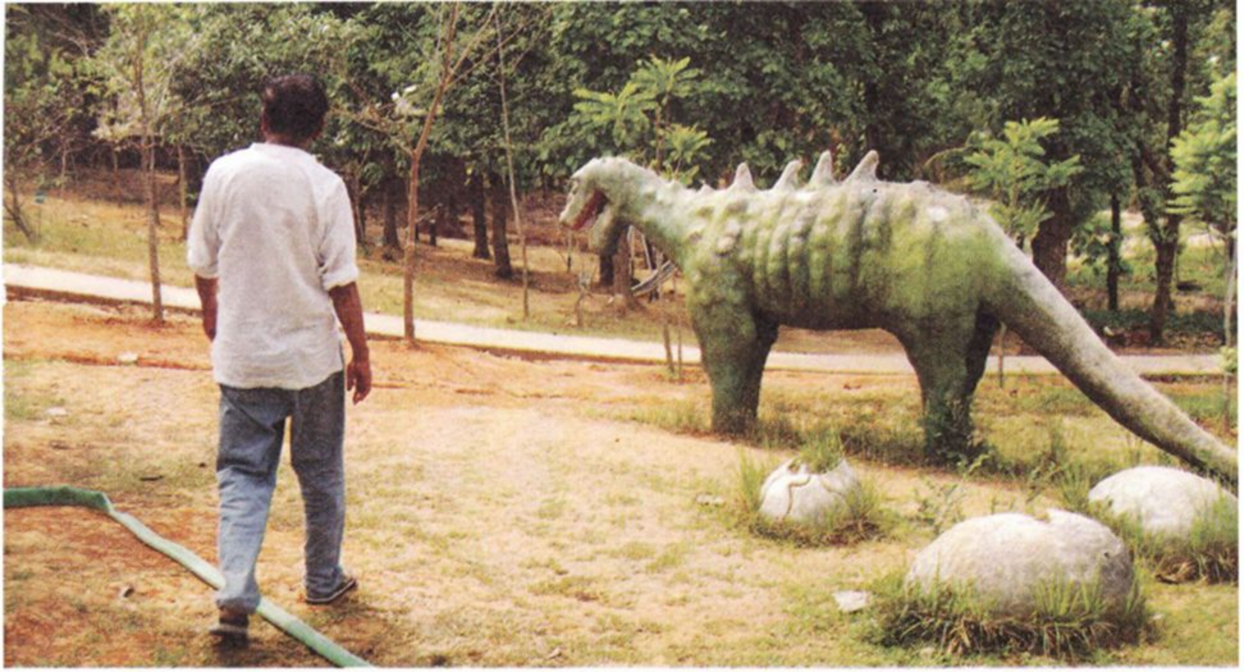
এ ভাস্কর্যটি তিনি নিজে কিনে এনে বসিয়েছিলেন

এর একটু দূরে দু'টো মিনিয়েচার ভাস্কর্য। রোমের ব্যাসিলিকার সামনের ঝর্ণায় যে মূর্তিটি বানানো হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে, তারই একটা ছোট অনুকরণ। এটা হুমায়ূন নিজেই কিনে এনেছেন সিঙ্গাপুর থেকে। একবার গুলশানের দোকান থেকে কেনেন এক তরুণীর ভাস্কর্য। তরুণী স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো একটি মশাল উঁচিয়ে রেখেছেন। তাকে রাখা হয় খেজুরগাছের তলায় বানানো এক ওয়াটার বড়ির কিনারে।

নুহাশপল্লীর শেষ সীমানা জুড়ে বেশ বড় একটা দিঘি। এই দিঘিটি আমার কাছে খুবই পরিচিত মনে হলো। হুমায়ূন আহমেদের এমন কোনো গ্রামের নাটক নেই যেখানে এই দিঘিটি ব্যবহার না হয়েছে। এই দিঘির ঘাটের পাড়ে বসে বড়শি বাওয়া, কিছু পাগল-ছাগলের দিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, এমন অনেক দৃশ্য দেখেছি এই দিঘিটা নিয়ে। দিঘির বর্তমান এ রূপ দেখে মনে হচ্ছে, বিগত প্রায় ১০ বছরে এ দিঘির পরিবর্তন হয়েছে অনেক। ২০০২-০৩ সালের নাটকগুলোতে দিঘির পাড়ে ছোট ছোট যে চারাগাছ দেখেছিলাম, এখন সেগুলো বেশ বড় হয়ে গেছে।

আজ দিঘিতে মাছ ধরা হচ্ছে। নিজের খাওয়ার জন্যে একটা বেশ বড়সড় সাইজের রুই মাছ ধরে নিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

আমরা দিঘির পাড়ে পুরো ৪০০ মিটার রেসের মতো একটা হন্টন চক্কর দিয়ে অবশেষে একই পথে টিলা বেয়ে উপরে উঠে ফেরত আসি নুহাশপল্লীর বড় মাঠটার কাছে। আমার ধারণা ছিল, গাইডেড ট্যুর সম্ভবত এখন শেষ, মুক্তি পাওয়া যাবে এবং দ্রুত ঢাকার পথে রওয়ানা দেওয়া হবে। কিন্তু তা আর হলো না।



দীঘি লীলাবতীর পাড়ে বানানো ডাইনোসরাসের ভাস্কর্য

নুহাশপল্লী দেখা শেষ করে ঘরে ফিরে যাব, জিনিসপত্র গোছানার জন্যে, এমন সময় ডাক পড়ল সুইমিং পুলের দিকে।

সকাল থেকে একটা মোটা নল দিয়ে পানি ভরা হচ্ছিল, টের পাওয়া গেল। এখন প্রায় কোমর পানি। বলা হলো, এখানে নামতেই হবে।

এই সুইমিং পুলটা আমার কাছে বেশ চেনা লাগল। এর আগে এখানকার একটা বিশেষ ছবি দেখেছিলাম। বেশ ক'জন বিশিষ্টজন খালি গায়ে এই পুলের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে আছেন। ঘটনাটা ছিল এমন যে, ২০০১ সালে একবার কলকাতার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি আমন্ত্রণ করে দেশে নিয়ে আসেন। সুনীল দম্পতি সরাসরি নুহাশপল্লীতেই চলে যান। পরদিন বেশ ক'জন প্রিয় বন্ধুকে তিনি ঢাকা থেকে আমন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কবি বেলাল চৌধুরী, *প্রথম আলোর সম্পাদক* মতিউর রহমান, কবি সাজ্জাদ শরীফ, অভিনেতা জাহিদ হাসান, ফেরদৌস, জাদুকর জুয়েল আইচ, *অন্যপ্রকাশের* মাজহারুল ইসলাম, মাসুম রহমান, কমল, ক্রুস্‌ক, আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন প্রমুখ। সবাই মিলে এই পুলে বেশ মজা করেছিলেন। এ পুলের একটা অংশে পানির কিছু উপরে ভেসে থাকা টেবিল গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাবা খেলাও হয়েছিল। অবশ্য এরকম আয়েশি আয়োজন তিনি প্রায় নিয়মিতই করতেন।

সকাল সকাল ঢাকা ফেরার ক্ষণটি গিয়ে শেষমেষ দাঁড়ালো বিকালে। গেট দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা দু'টো মানবমূর্তির ভাস্কর্য হঠাৎ করে চোখে পড়ল। এ দু'টো ভাস্কর্য অনেক আগেই চোখে পড়ার কথা ছিল, কিন্তু পড়ে নি।

প্রবেশপথের গেটের পরেই এক মধ্যতিরিশের মহিলা তার আট-দশ বছরের এক শিশুপুত্রকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। প্লাস্টার অব প্যারিস-এর উপর সাদা রঙের প্রলেপ পুরো ভাস্কর্য যুগল জুড়ে। এটা ঠিক কাদের ভাস্কর্য বা কিসের প্রতীক রূপে এসেছে বোঝা গেল না। শাড়িপরা যে মহিলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, তার বয়কাট চুল। হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটি একটা হাত উঁচিয়ে মা'কে দেখাচ্ছে সামনের উদ্যান।

যে ভাস্কর এটা বানিয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে হয়তো জানা যেত এর প্রকৃত রহস্য। দেখি, একদিন স্যারকেই না হয় জিজ্ঞেস করব ওই মহিলা ও শিশুপুত্রের ভাস্কর্যের গল্পটা। এমনও হতে পারে, এগুলো এমনিতেই বানানো দু'টো মানুষের রূপ। কী জানি! আমরা ঢাকার পথে রওয়ানা দেই।

এর বেশ ক'দিন পর একদিন নুরুল হক ভাইকে নিয়ে নুহাশপল্লী ঘুরতে বেরোলাম। এর কারণ ছিল মূলত ভাস্কর্যগুলোর পরিচয় জানা। হক ভাই বলেন, মূল মানুষই তো এখানে আছে, তারে ডাকি ?

কিছুক্ষণের মধ্যে হাজির হলেন এক তরুণ। তার নাম আসাদুজ্জামান খান। পেশায় ভাস্কর। এটা অবশ্য তিনি বলতে নারাজ। কাজ করেন রাজমিস্ত্রির সঙ্গে, বাড়ি এই নুহাশপল্লীর লাগোয়া পিরুজালী গ্রামে। গাছের শেকড় বাকল দিয়ে তিনি নানা রকমের অবয়ব তৈরি করতে পারেন। একবার হুমায়ূন আহমেদকে তার কিছু কাজ দেখালেন। হুমায়ূন তাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন।

এর আগে সিনেমার সেটের জন্য ভাস্কর্য বানাতেন এমন একজনকে [নিত্য চন্দ্র বর্মন] কিছু ভাস্কর্য বানানোর কাজ দিয়েছিলেন তিনি। পদ্মপুকুরের মৎস্যকন্যা আর দৈত্যটার ভাস্কর্য বানানো শুরু করেছেন তখন নিত্য চন্দ্র। তার সঙ্গে যোগ দেন তিনি। দু'জনে মিলে বানালেন মৎস্যকন্যার ভাস্কর্য।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নুহাশপল্লীর ভাস্কর্যসমূহ







হুমায়ূন আহমেদের ভাস্কর্যপ্রীতি খুব বেশিই ছিল। একবার অনেক পয়সা খরচ করে তিনটি ভাস্কর্য বানালেন। দেখে পছন্দ হলো না। শরীরে সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আনুপাতিক ছিল না। স্কেলে সমস্যা ছিল। ভাস্কর্য বসানোর লোকজনকে ডাকা হলো হাতুড়ি-শাবল নিয়ে আসতে। এগুলো বানাতেও খরচ, ভাঙতেও খরচ। অনেক টাকা খরচ করে সেগুলো রাতারাতি ভেঙে ফেলা হলো।

এরপর থেকে আসাদ প্রায় নিয়মিত হয়ে যান। ছোট-বড় মিলে ৪টা ভাস্কর্য বানিয়েছেন তিনি।

মৎস্যকুমারীর পর বানিয়েছিলেন মা-ছেলের ভাস্কর্য। নুহাশপল্লীর গেট দিয়ে ঢুকতেই বাঁ হাতের ডানপাশে এই যুগল ভাস্কর্য। মধ্যতিরিশের এক মা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তার বাঁ পাশে ৭-৮ বছর বয়সী হাফপ্যান্ট পরা এক শিশুপুত্র। মা বাঁ হাতে ছেলেকে ধরে রেখেছেন, ছেলে ডান হাত বাড়িয়ে মাকে দেখাচ্ছে সামনের উদ্যান।

এই ভাস্কর্যের ধারণা সম্পূর্ণ হুমায়ূন আহমেদের দেওয়া। এই ধারণার কোনো ব্যাখ্যা তিনি কাউকে দেন নি, ভাস্করও কখনো জানতে পারেন নি। তবে এটা দেখে তিনি খুশি হয়েছিলেন, পছন্দ হয়েছিল তাঁর।

নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদের নিজের থাকার ঘরের সঙ্গে এক নারীমূর্তি। প্রমাণ সাইজের এই তরুণী ফলের ডালা মেলে রেখেছে সামনে। এই ডালার মধ্যে আছে আপেল, আঙুর আর কলা। যেন নুহাশপল্লীতে বেড়াতে এসেছেন কেউ, তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন এই অত্যন্ত রূপবতী তরুণী।

নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদের অভ্যর্থনা সব সময় রাজকীয় ছিল। আমার দেখার তেমন সুযোগ হয় নি। তবে অনেক গল্প শুনেছি। *অন্যপ্রকাশের* মাজহারুল ইসলাম তাঁর নববিবাহিতাকে নিয়ে প্রথম যেদিন নুহাশপল্লীতে পা দিয়েছিল, তাঁর স্ত্রীর

নুহাশপল্লীর বেশ কয়েকটি ভাস্কর্যের নির্মাতা সৌখিন ভাস্কর আসাদ









আলাদিনের দৈত্য ও মৎস্যকুমারীর ভাস্কর্য

জন্যে পালকির ব্যবস্থা হয়েছিল। নুহাশপল্লীতে তখন নৌকা করে আসতে হতো। এখনকার দিঘি লীলাবতীর ওপারে নৌকা এসে ভিড়তো। নৌকা ঘাট থেকে বাড়ির উঠান পর্যন্ত আসার জন্যে ব্যবস্থা হলো পালকির। উঠান থেকে ঘর পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে লাল রঙের কার্পেট বিছানো হলো। নববধূ পায়ে কাদা লাগানোর কোনো সুযোগ পেলেন না, বরং মুগ্ধতার অভিব্যক্তি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

আসাদুজ্জামান নূর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম যেদিন নুহাশপল্লীতে গেলেন, গেট থেকে তাঁর জন্যেও লালগালিচা পাতা ছিল, ব্যান্ডপার্টি বাজনা বাজাল, একটা হাতি এসে কাছে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামার পর হাতির পিঠে চড়ে তাঁকে নুহাশপল্লীতে যেতে হলো।

আমি একদিন কামরাঙার শরবত খেয়েই মুগ্ধ হলাম। কোনো এক ছুটির দিনে দুপুরবেলা আমরা গিয়েছি। তখন গরমের দিন। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি ট্রের উপর রুমাল দিয়ে ঢেকে কামরাঙার শরবত হাতে মোস্তফা দাঁড়িয়ে, মোস্তফার পেছনে হুমায়ূন আহমেদ ও শাওন। গাছের লেবু, গাছের কামরাঙা, সঙ্গে একটু বিট-লবণ, কয়েক কুচি বরফ। চমৎকার ওয়েলকাম ড্রিংক।

তিনি যখন বর্তমান থাকবেন না, তখন এই পাথুরে মূর্তিই যেন কতকগুলো পাথুরে ফলমূল নিয়ে তাঁর অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে এমন চিন্তা থেকেই এটা এখানে বসানো।

এই ভাস্কর্যটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন সিঙ্গাপুর প্রবাসী ব্যবসায়ী এবং লেখক শহীদ হোসেন খোকন। তিনি যখনই সিঙ্গাপুর গিয়েছেন, এই খোকনই তাঁকে



বৃক্ষপ্রেমী হুমায়ূন আহমেদের এ ভাস্কর্যটি রাখা আছে ঔষধি বৃক্ষের উদ্যানের পাশে

সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিয়েছেন। শেষমেষ যে বারে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হলেন, সে সময়ও এই খোকন ভাইয়ের হেফাজতেই তিনি [illegible] ছিলেন।

নুহাশপল্লীর ছোট্ট একটা ভাস্কর্য আছে। ছত্রাকের ভাস্কর্য। মাশরুমের ৫টি ছোট বড় পাতা নানাভাবে ছড়িয়ে ছাতার আকার নিয়ে আছে। নিচে মাটির পাত্র। এখানেই জমে থাকে পানি।

নুহাশপল্লীতে সবচেয়ে বড় ভাস্কর্যটি হচ্ছে পদ্মপুকুরের টিলার উপর। তার মুখটি বড়ই বীভৎস। এ ছবিটা দেখে বাচ্চারা দৈত্যের ধারণা যাতে পায় তার চেষ্টা করা হয়েছে।

দৈত্য দানব বা ভূতপ্রেত নিয়ে হুমায়ূনের আগ্রহের শেষ ছিল না। বিষয়টি নিয়ে তিনি যথেষ্ট কৌতূহলীও ছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে তার কিছুই হয়তো বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু এ বিষয়গুলোর অস্তিত্ব নিয়ে তিনি খানিক সংশয়বাদী ছিলেন বলে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

তাঁর অনেক ভূত-প্রেতের কাহিনি ছিল এই নুহাশপল্লীকে ঘিরে, অনেক সময় আজকের আমার এই সহচর নুরুল হক ভাইও ছিলেন তার সাক্ষাৎ চরিত্র।

বিগত ১৫ বছর ধরে এই নুহাশপল্লীই নুরুল হকের ঠিকানা। এর মধ্যে ১১টি রাত তিনি একা কাটিয়েছেন এই বিশাল জঙ্গলের মধ্যে। তখন বিদ্যুৎ আসে নি এখানে। নিগূঢ় অন্ধকারের মধ্যে হক ভাই মাথা নাড়েন—না।

ভূতের ভয় ?

নুরুল হক ভাই হাসেন।



ভূত বিলাসী

নুহাশপল্লীতে ভূতের গল্প শুনি আমার প্রথম রাতেই, ২০০৮ সালের ৮ এপ্রিল। অন্ধকার রাতে টর্চ হাতে নিয়ে হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে বাগান পরিদর্শন করে এসে আমরা ফিরে গিয়ে যে যার ঘরে শুয়ে থাকি। হুমায়ূন আহমেদের মাস্টার বেডরুমের পাশের ঘরটিতে দু'টো বিছানা। তার একটিতে আমি আর মাজহার। আমি ঘুমানোর চেষ্টা করব, এমন সময়ই মাজহার ভূতের গল্প শুরু করে।

ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। প্রচুর মানুষকে ভূতের গল্প বলতে শুনেছি। আমার নিজের কপাল পোড়া, কখনো ভূত দেখতে পারি নি। যারা দেখেছেন বলে বলেছেন, সবার কথায় আমি সন্দেহ পোষণ করেছি। কিন্তু গভীর রাতে একা একা জঙ্গলে গিয়ে ভূত দেখে আসব, সে সাহসও কখনো করি নি।

আমার বারণ সত্ত্বেও মাজহার আমাকে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে—গল্পটা কিন্তু এই ঘরেরই। 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত' ছবির শুটিংয়ের সময় এই ঘর থেকেই ভূতেরা অভিনেতা রহমত আলীকে টেনে বের করে ফেলেছিল। অল্পের জন্যে নিয়ে যেতে পারে নি। তিনি যখন ঘুম থেকে জেগে টের পেলেন—অশরীরী কিছু তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি পুরো কাপড়-চোপড় ও বিছানাবালিশ নষ্ট করেন এবং পরদিনই শুটিং বাদ দিয়ে ঢাকা ফেরত যেতে চান।

মাজহার সেই ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিতে চায়, আমি আর শুনি না।

সে জয়ন্তদার উদাহরণ দেয়। জয়ন্তদা [অভিনেতা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়] নাকি প্রায়ই বলেন যে, তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু নুহাশপল্লীতে যে ভূত আছে এটা তিনি বিশ্বাস করেন।

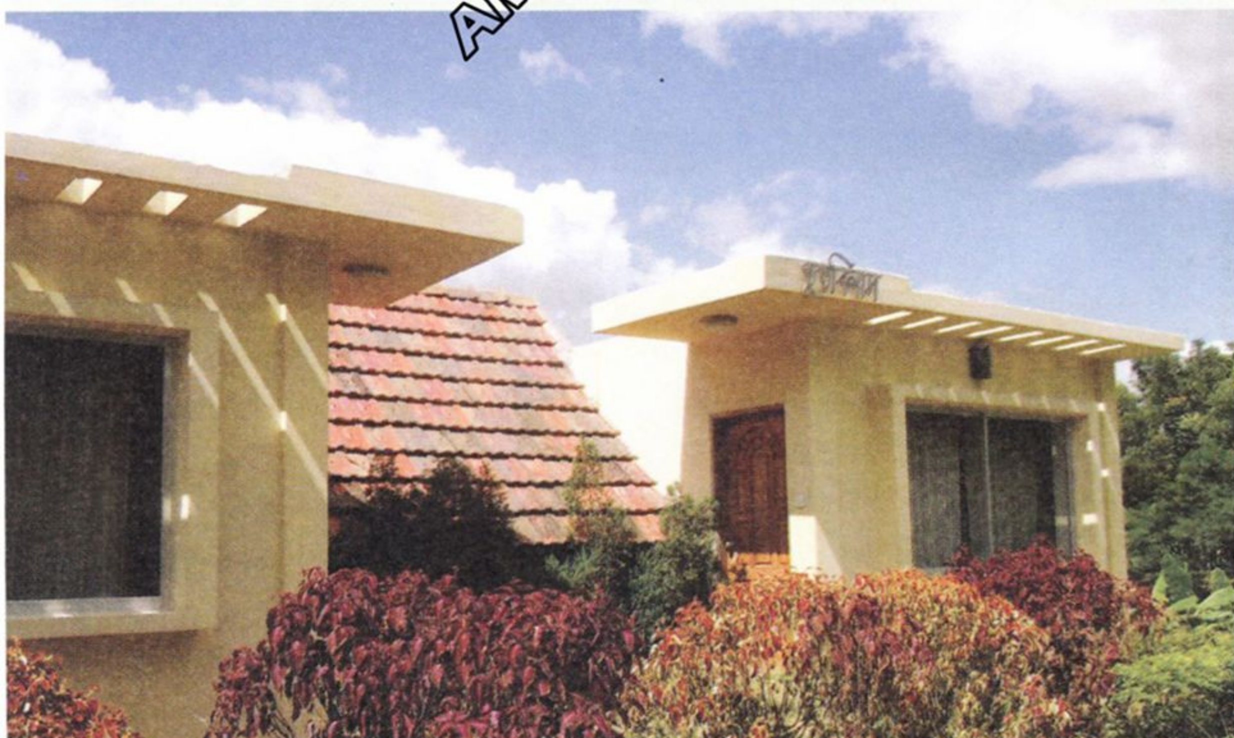
মাজহারকে বলি, তুমি দয়া করে বিছানা বদল করো আমার সঙ্গে। জানালার পাশের এ বিছানায় আমি শোব না। থাই অ্যালুমিনিয়ামের গ্রিল ছাড়া এই কাঁচের জানালার প্রতি আমার ভরসা নাই। ভূত না আসুক, অন্য কিছু তো আসতে পারে ?

মাজহার রাজি হয়। জানালার পাশের বিছানা ছেড়ে আমি দরোজার পাশের বিছানায় শুয়ে থাকি। ঘরে এসি আছে। আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মুখ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

নুহাশপল্লীর ভূত নিয়ে বাজারে নানা রকমের কথা আছে। এসব কথা সবচেয়ে বেশি বলতেন হুমায়ূন আহমেদ নিজেই। হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায় যে, নুহাশপল্লীতে প্রথম ভূতের আবির্ভাব হয় এ পল্লীতে বসবাসের এক বছর পরই। পিরুজালী গ্রামের এক হুজুর তাঁকে প্রথম জানান যে, তার কাঠের বাড়ির দরোজার সামনে রাতের বেলা যে চারটে কুকুর শুয়ে থাকে তারা প্রকৃতপক্ষে জ্বিন, কুকুরের বেশ ধরে থাকে। কথাটি তিনি বিশ্বাস করেছেন বলে মনে হয় না। এই হুজুরই তাঁকে বলেছিলেন, জ্বিনেরা কুকুর বা সাপের বেশে নুহাশপল্লীতে বসবাস করছে। একবার তার কাঠের ঘর ভাঙার সময় ফলস সিলিংয়ের ভেতর থেকে দু'টো সাপ বেরিয়ে এল। তার লোকজন সাপগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে পিটিয়ে মেরে ফেলল। জ্বিনেরা কেন স্বমূর্তি ধারণ করে চলে গেল না, এ নিয়ে তার মনেও প্রশ্ন ছিল।

২০০০ সালে, নুহাশপল্লীর বয়স যখন আড়াই-তিন, সে সময় জ্বিনের মহাপোদ্রব ঘটেছিল নুহাশপল্লীতে। জ্বিনের ভয়ে নাকি তার 'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এর ইউনিটের সব লোক স্পট ছেড়ে ঢাকায় চলে গেল। কোনো ক্রুই সেখানে থাকল না। একমাত্র নুরুল হককে নিয়ে তিনি একা রাত্রি যাপন করছেন। একদিনের ঘটনা—রাত ন'টা। নুরুল হক রান্না চড়িয়েছে। তিনি লিচু-বাগানের বেদিতে বসে আছেন। হঠাৎ ঝড়ের মতো উঠল। লিচুগাছের পাতায় বাতাসের শব্দ হতে লাগল। লিচু-বাগানে চারটা লিচুগাছ। তিনি যে গাছের নিচে বসেছিলেন তার পাতা ও ডাল কাঁপছে, অন্য গাছের

ভূতবিলাস নামে দুটি কটেজ বানানো হয়েছে দিঘি লীলাবতীর পাড়ে। ছবি : আখতারুজ্জামান চৌধুরী

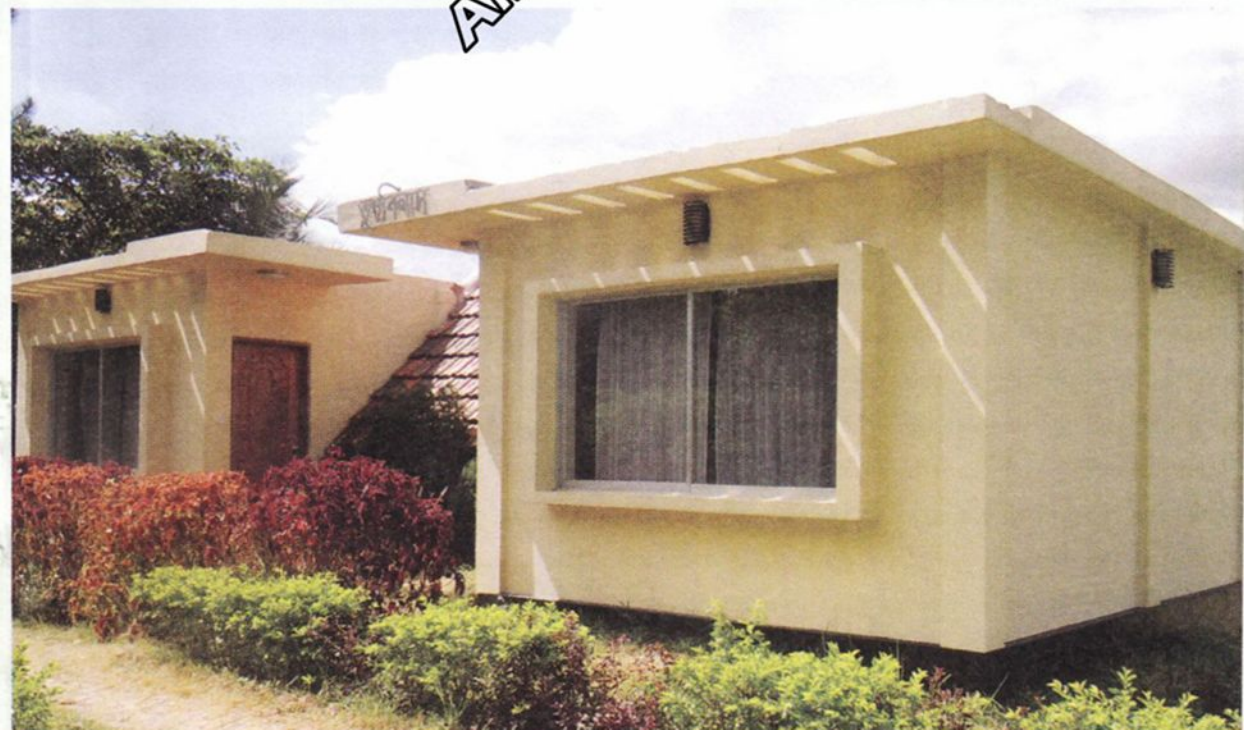


পাতায় বাতাসের কাঁপন নেই। ভয়ে তাঁর কলিজায় কাঁপুনি শুরু হওয়ার কথা, কিছুই হলো না। এসব কথা তিনি লিখেছেনও।

নুহাশপল্লীর জ্বিন নিয়ে ঘটনার শেষ নাই। স্যারের নিজের লেখাতেও তার অনেক বর্ণনা।

> নুহাশপল্লীতে কী একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। সন্ধ্যা পার হয়েছে। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আলোকসজ্জা। হাজারখানিক মোমবাতি চারিদিকে জ্বালানো হয়েছে। বারবিকিউয়ের প্রস্তুতি চলছে। সুইমিং পুলের চারপাশে সবাই জটলা করছে। পার্টি জমে উঠেছে। হঠাৎ মেয়েদের মধ্যে কেউ বিস্মিত গলায় আঙুল উঁচিয়ে বলল, এটা কী?
>
> আমরা সবাই তাকালাম। সুইমিং পুলের পেছনে জবা গাছের ঝাড়। ঘন জঙ্গলের মতো হয়ে আছে। সেই ঘন জংলায় একটি মেয়েমানুষের মূর্তি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মূর্তিটি মনে হচ্ছে আলোর তৈরি। সে দাঁড়ানো থেকে বসছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে।
>
> সবাই হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। নুহাশপল্লীর একজন কর্মচারী 'কে? কে?' বলে জংলার দিকে ছুটে যেতেই ছায়ামূর্তি সবার চোখের সামনে মিলিয়ে গেল।

ভূতবিলাস নামে দুটি কটেজ বানানো হয়েছে দিঘি লীলাবতীর পাড়ে। ছবি : আখতারুজ্জামান চৌধুরী



পার্টি ভেঙে গেল। সবাই ঘরে চলে এলাম। যে মেয়েটি প্রথম ছায়ামূর্তি দেখেছে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার মাথায় পানি ঢালা হতে লাগল।

প্রায় চল্লিশজন অতিথির সবাই স্বীকার করলেন, তারা ব্যাখ্যার অতীত একটি ঘটনা দেখলেন। এদের মধ্যে ঔপন্যাসিক মঈনুল আহসান সাবেরও ছিলেন। যদিও তিনি ঢাকায় এসে এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাঁর ধারণা নুহাশপল্লীর লোকজন ছাদ থেকে নানান ধরনের আলো ফেলে এই ছায়ামূর্তি তৈরি করেছে।

তাঁর ধারণা সত্যি নয়। নুহাশপল্লীর বাংলোতে ছাদে উঠার কোনো ব্যবস্থা নেই।

–(*বলপয়েন্ট*/ হুমায়ূন আহমেদ)

২০০৮ সালের শেষের দিকে একরাতে আমরা প্রায় বারোটা পর্যন্ত নুহাশপল্লীতে থেকে ঢাকায় চলে আসি। ফিরতে একটু দেরিই হলো, কারণ সেরাতে 'এনায়েত আলীর ছাগল' নামক একটা নাটকের শুটিং ছিল 'বৃষ্টিবিলাস'-এর বারান্দায়। বেশ কিছুক্ষণ শুটিং দেখে আমরা চলে আসি। স্যারদের প্ল্যান–২/৩ দিনই থাকার কথা। কিন্তু পরদিনই মাজহারের ফোন, স্যারেরা শুটিং প্যাক-আপ করে ঢাকায় চলে এসেছেন, আসো, মজার গল্প আছে।

যথারীতি *দখিন হাওয়ার* বাসায় আবার হাজির হলাম। স্যারের তৃতীয় যে বেডরুমকে এডিটিং প্যানেল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে ফ্লোরের উপর সবাই বসে আছেন। কথা বলছে শুধু শাওন।

সুইমিংপুলের পাশে এক ভয়ানক দৈত্যের মুখ দিয়ে জল প্রবাহের ব্যবস্থা রেখেছিলেন দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য



আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে *দখিন হাওয়ার* প্রতিবেশী বাসিন্দাদের বাইরে শুধু জুয়েল আইচ ছিলেন, আমি এসে যোগ দিলাম শেষে।

শাওন গল্পের মাঝামাঝিতে। আমাকে দেখে স্যার আবার প্রথম থেকে শুরু করতে বলেন। শাওনের ঘটনা বর্ণনা করার কায়দাটা বেশ ভালো। খুব গুছিয়ে সাজিয়ে কথা বলে, কোনো ফাম্বলিং নাই। বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে নুহাশপল্লীর ভূতের, তাজা গল্প। গতকাল রাতেই, আমরা চলে আসার পর, রাত প্রায় ২টার সময় শাওন প্রায় চিৎকার করে ওঠে, কারণ সে টের পায় যে–তার বেডরুমের ভেতর কেউ একজন ঢুকে তার বিছানার পাশে বসে তার পিঠের উপর হাত রেখেছে।

শাওনের চিৎকার শুনে হুমায়ূন আহমেদের ঘুম ভাঙে। তিনি নিজেও দেখেন যে ছায়ামূর্তির মতো এক মানবমূর্তি অতি শান্ত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বেডরুমের বাতি নেভানো, বাইরে বাতি জ্বালানো এবং দরোজা আধখানা খোলা। এরপর হুমায়ূন আহমেদ নিজে যোগ করলেন বাকি অংশ। বললেন, 'শাওন যেদিকে আঙুল দেখাচ্ছে আমি সেদিকে তাকালাম। আমার চোখে চশমা নেই, আমি স্পষ্ট কিছু দেখছি না। তারপরেও মূর্তিকে দেখলাম। সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করিডরের শেষপ্রান্তের দরজা বন্ধ করল। আমার কাছে মনে হলো নার মূর্তি। এর মধ্যে ঘরের বাতি জ্বালানো হয়েছে। আমি দৌড়ে গিয়ে করিডরের দরজা খুলেছি। কোথাও কেউই নেই।'

ঘটনা হয়তো এখানেই শেষ, কিন্তু হলো না। পরের সপ্তাহে আবার তাদের নুহাশপল্লীতে যেতে হলো এবং সেটা এই নাটকটি শেষ করার জন্যে।

নুহাশপল্লীতে স্যার খুব বেশিদিন তাঁর নিজের মতো একা একা থাকতে পারেন না। এক দু'দিন পরই হাঁপিয়ে উঠতেন। মাজহারকে তলব করা হতো। অমুক

অন্ধকার রাতে এই গাছতলা দিয়ে হুমায়ূন আহমেদের ভূতগুলো চলাচল করত



অমুককে নিয়ে চলে আসো। যথারীতি এক বিকেলে গিয়ে হাজিরও হলাম। শর্ত সাপেক্ষে যাওয়া—রাতে খেয়ে চলে আসব, সে যত রাতই হোক।

এবার গিয়ে দেখি, বেশ গম্ভীর গম্ভীর একটা পরিবেশ বিরাজ করছে নুহাশপল্লীর এই বাংলোয়। যে হল রুমে [বা ড্রইংরুম] বসে আমরা আড্ডা দিতাম, সে ঘরটাকে বানানো হয়েছে বেডরুম। কাঁথা-বালিশ ছড়ানো-ছিটানো। কিন্তু তাঁরা একা নন, তাঁর কলেজ-জীবনের বন্ধু সেহেরী সাহেবও সস্ত্রীক সেখানে এবং তাঁরাও এ রুমে ঘুমান।

খবর নিয়ে জানা গেল, সে রাতের ভূত দর্শনের পর সেই বেডরুমটিতে ঘুমাতে আর সাহস পাচ্ছে না শাওন। সেকারণেই সঙ্গ দেওয়ার জন্যে ঢাকা থেকে সেহেরী দম্পতিকে দাওয়াত করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বড় হল ঘরটিতে সবাই মিলে একসঙ্গে ঘুমালে যদি ভয়টা কম লাগে এজন্যে ছিল এই আয়োজন।

নুহাশপল্লী একটি ভৌতিক জায়গা হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পর হুমায়ূন আহমেদ বিকল্প ব্যবস্থা ধরলেন। এ ঘটনা আমার নিজের দেখা। ২০১১ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস। *ঘেটুপুত্র কমলার* ইনডোর কাজের জন্যে সেট বানানো হয়েছে নুহাশপল্লীতে। দিন-রাত শুটিং চলছে। এক রাতে শুটিংয়ের দর্শক হিসেবে আমিও উপস্থিত।

রাত বারোটার দিকে শুটিং শেষ। এবার ভূত প্রদর্শনের ব্যবস্থা। হঠাৎ করে দেখি—কালো ও সাদা দুই রঙের দু'টো ছায়ামূর্তি হাঁটাহাঁটি করছে।

কারও নজর পড়ল ওদিকে। ছোট দু'টো বাচ্চা অভিনয় করছিল, তাদের দুই মা প্রায় চিৎকার করে ওঠেন। একসময় মূর্তিযুগল ধীরে ধীরে সামনে এসে হাজির হয়। কালো ও সাদা বোরখার মতো কাপড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল নুহাশপল্লীর দুই স্টাফ।

স্যারের চোখে মুগ্ধতার হাসি।

এক মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনো কি ভূতের ভয় পাবেন?

নুহাশপল্লীর নানা রকমের ভৌতিক কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার বহু চেষ্টা করেছেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর আত্মজৈবনিক লেখাগুলোতে উত্তম পুরুষের এমন ভৌতিক বর্ণনা বিনা কারণে বিশ্বাস না করার উপায় নাই। আমি পড়ে গেলাম বিপদে। কী করে অবিশ্বাসই বা করি! এটা তো তাঁর নিজেরই লেখা। তিনি কি তবে এসব বানিয়ে লিখতেন? নুহাশপল্লীর নানা রকমের ভৌতিক ঘটনার সাক্ষী অনেক জনকে ব্যক্তিগতভাবে আমি জিজ্ঞাসাও করেছি। যেমন—

১. কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা আগুন। একবার নুহাশপল্লীর বাঁশঝাড়ের ভেতর আলোছায়ার মধ্যে সাদা কাপড়ের ভূত দেখে তিনি গুলি করতে চেয়েছিলেন। তার যুক্তি ছিল, ওরা যদি ভূতই হয়ে থাকে, গুলি তাদের স্পর্শ করবে না। তাকে গুলি করা থেকে থামানো হয়।

২. মাজহার বলেছে, ফোনে ১ মিস কল, ২ মিস কল ও ৩ মিস কলের সংকেত দিয়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে থাকা অপর পাশের 'ভূত'কে সে বহুবার নিয়ন্ত্রণ করতো। সে নিজেও একবার সাদা কাপড় পরে বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে হেঁটেছে। অভিনয়টা এতই নিখুঁত ছিল যে, তার স্ত্রীও তাতে ভয় পেয়েছিল। কারণ, অন্ধকারের ভেতর সাদা কাপড় ফেলে রেখে ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে ভূতগ্রস্তদের দলে ভিড়ে যায়।

৩. রহমত ভাই [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ও অভিনেতা] বললেন, আমি আসলে ভয় পাওয়ার অভিনয় করেছি, যাতে হুমায়ূন আহমেদ আমাকে ভীত করতে পারার আনন্দ উপভোগ করেন। কথাটি আমি তাঁকে কখনোই জানতে দেই নি যে তাঁর ছেলেরা যখন আমার বুড়ো আঙুল ধরে টানাটানি করে, তখন আমি ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি। আমি বলেছি যে, আমি ভূত দেখে ভয় পেয়েছি, তিনি সারা জীবন তা-ই জেনে থাকবেন। এটাতেই আমার আনন্দ। আর কাপড়চোপড় নষ্ট করার ঘটনাটা একেবারেই বানানো।

৪. বেডরুমে শাওনের ভূত দেখার বিষয়টি হুমায়ূন আহমেদের সাজানো নাটক —এ কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন জুয়েল আইচ। শাওনকে ভূত দেখার আনন্দ দেওয়ার জন্য হুমায়ূন আহমেদ এটা করেছিলেন। আর পরবর্তী সময়ে বেডরুম বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় লোকজন নিয়ে শুয়ে থাকার কারণ হচ্ছে, আগের রাতে দেখা ভূতের বিষয়টাকে সমর্থন দিয়ে তাকে অ্যাস্টাবলিশ করা। ভেতরে ভেতরে হুমায়ূন আহমেদ সারাক্ষণ মুচকি হাসি হেসেছেন, আমি নিশ্চিত।

কত বিচিত্রভাবে মানুষকে আনন্দ দেওয়া যায়, মানুষকে মুগ্ধ করা যায়, এটা তাঁর একটা সাধনা ছিল। ভূত-প্রেতে নিজে কখনোই বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। কিন্তু একথা কাউকেই বলতেন না। ভূত নিয়ে লিখেছেন অনেক। তাঁর একটা নাটকও আছে, নাম 'ভূত বিলাস'। জ্যোৎস্না, সমুদ্র, বৃষ্টির সাথে বিলাস লাগিয়ে নাটক বানিয়েছেন। উপন্যাসের নাম দিয়েছেন, বাকি ছিল ভূত নিয়ে। সেটাও বানালেন। শুধু তা-ই নয়, নুহাশপল্লীতে বৃষ্টিবিলাসের সাথে মিল রেখে দিঘি লীলাবতীর পাড়ে বানালেন দুটো কটেজ। যারা রাতের বেলা ভূত দেখে আনন্দ পেতে চান, তাদের জন্য এই কটেজ। ডিজাইন করেছেন তাঁর স্থপতি স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন। তাঁর এই কটেজগুলোরও নাম দিয়েছেন তিনি ভূতবিলাস। আপাতত দুটো কটেজ বানিয়ে রেখেছেন। আরও ৪টার জন্য জায়গা রাখা আছে। এই হচ্ছেন ভূত-বিলাসী হুমায়ূন।



নিউইয়র্কে প্রথম দফার চিকিৎসার কালে হুমায়ূন আহমেদ।
ছবি : মাজহারুল ইসলাম

চিকিৎসা-বিরতিতে নুহাশপল্লী

১১ মে বিমানবন্দর থেকে হুমায়ূন আহমেদ সরাসরি চলে গেলেন নুহাশপল্লী। আমার যাওয়া হয় নি। সকালবেলা বাসায় ফিরে এসে দেখি বউয়ের শরীর খারাপ। অফিসে চলে যাই। সে নিজে পাশের হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চেকআপ করাতে গেল, ডাক্তার ভর্তি করে দিয়েছে। ওকে হাসপাতালে রেখে নুহাশপল্লীতে কী করে যাই, চিন্তায় পড়ে যাই। মাজহার ফোন করছে। হুমায়ূন আহমেদ নাকি বারবার আমার কথা জিজ্ঞেস করছেন।

১২ তারিখ রাতে হাসপাতালের ডাক্তার জানালেন, জলীকে কাল ছেড়ে দেবেন। আমি ১৩ মে নুহাশপল্লীতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। নুহাশপল্লীতে আমাদের সান্ধ্য আড্ডাটা অনেক আমোদের। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে আমি কী করে বাসার বাইরে থাকি? আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী। তার উপর সদ্য হাসপাতাল ফেরত স্ত্রীর এ নিয়ে পরবর্তী গঞ্জনাসমূহ সহ্য করতে হবে, এমন চিন্তা মাথায় নিয়ে সকালবেলাই রওয়ানা হলাম নুহাশপল্লীর দিকে।

গিয়ে দেখি বেশ ক'টি টেলিভিশন চ্যানেল ক্যামেরা তাক করে রেখেছে তাঁর দিকে। তিনি হাঁটছেন আর কথা বলছেন। একসময় ঘরের পাশের রট আয়রনের চেয়ার-টেবিলগুলোর ওখানে বসিয়ে বসিয়ে কথা বলছেন কয়েকজন। তারপর বিদায়। আমরা ঘরে ঢুকে পড়ি।

নুহাশপল্লীর বড় হলঘরটিতে আমরা বসে পড়ি। এই ঘরে কোনো চেয়ার বা সোফা নেই। তার একপাশে মেঝে থেকে ছাদ বরাবর টানা লাইব্রেরি। কিছু বই হুমায়ূনের লেখা, বাদ বাকি বইগুলো তাঁর পছন্দের। মাঝামাঝি জায়গায় মার্বেল পাথরের একটা বড় টেবিল, দেড় ফুট উঁচু। জাপানিরা যে রকম টেবিলে বসে খায়, অনেকটা সে রকমই এই টেবিলের আকার। ১০-১২ জন অনায়াসে বসে খাই এ টেবিলে। বহু খেয়েছি। তিনি দলবল ছাড়া খাওয়া পছন্দ করেন না। এই দল যে জম্পেশ আড্ডা দিতে দিতে আর খেতে খেতে খাওয়ার গুনগান কিংবা বদনাম করতে করতে খেত, এখন তার থেকে কিঞ্চিৎ অন্য রকম হওয়ার কথা। কিন্তু হয় না। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বরণ করতে যাওয়া একজন মানুষের মধ্যে এ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। আছে রসিকতা। দেশে ফেরার তৃতীয় দিনে, দুপুরে খাওয়ার পরে শুরু হলো গল্প। বিগত ৮ মাস কীভাবে আমেরিকায় কাটালেন এবং ডাক্তারের কাছ থেকে কী

পরামর্শ নিয়ে দেশে এলেন—এ তারই কাহিনি। কাহিনিটি তিনি নিজে গুছিয়ে বলতে পারেন না। দু'-এক লাইন বলার পরই রসিকতা শুরু করে দেন। বলেন, শাওন, খুব ভালো বলতে পারে সবাইকে। শাওন গল্প শুরু করে।

> হুমায়ূন সাহেবকে স্লোন ক্যাটারিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখে। সবাই এক্সাইটেড। নেগেটিভ দিক থেকে এক্সাইটেড। না জানি কী হয়। টেনশনে আমাদের এমন অবস্থা যে আমরা ঠিকমতো বসে থাকতেও পারছি না। প্রতি সেকেন্ডে একবার বসছি তো একবার উঠে দাঁড়াচ্ছি। এই অবস্থায় আমরা ডাক্তারের রুমে ঢুকলাম। ডাক্তার একজন পেশেন্টের সঙ্গে চারজন অ্যাটেনডেন্টকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। আমেরিকাতে তো এ রকম হয় না। বেশির ভাগ রোগী একাই চিকিৎসা নিতে আসে। ডাক্তার রিপোর্ট দেখলেন। সিঙ্গাপুরের টেস্টের রিপোর্ট ঠিক ধরে ট্রিটমেন্ট শুরুর কথা বললেন। ডাঃ ভীচ বললেন, এটা হচ্ছে, কনভেনশনাল কেমোথেরাপি। এক শ'জন রোগীর মধ্যে এক শ'জনকেই এই থেরাপি দেওয়া হয়। তোমরা চাইলে সিঙ্গাপুর, ইন্ডিয়া বা তোমার নিজের দেশে অথবা যে-কোনো সিটি হসপিটালেই এই কেমোথেরাপি নিতে পার। কিন্তু আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম যে, আমরা এই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে চাই। তখনো আমরা বুঝতে পারি নি যে এই কেমোর জন্য মেমোরিয়াল স্লোন ক্যাটারিং আসলে লাগে না। এর মধ্যেই

চিকিৎসা বিরতিতে প্রায় সারাটা সময়ই তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের সঙ্গে



হুমায়ূন আহমেদ প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ডাক্তার, আমি কি মারা যাচ্ছি ? ডাক্তার বললেন, আমরা সবাই জন্মেছি মারা যাওয়ার জন্যে। তবে খুব শিগগির তুমি মারা যাচ্ছ না। তার কথা শুনে আমরা খুব খুশি। ওর থেরাপি শুরু হবে। আমি বললাম, ওর কি সার্জারি লাগবে ? ডাক্তার বলল, না না, এই মুহূর্তে কোনো সার্জারি লাগবে না।

হুমায়ূন আহমেদ কথা বলে ওঠেন—আমরা হ্যাপি, মাই গড, সার্জারি লাগবে না!

শাওন আবার শুরু করে,

আমাদের জানটা খুশিতে ভরে গেল। তাড়াতাড়ি বাংলাদেশে ফোন করলাম। সার্জারি লাগবে না। সার্জারি ছাড়াই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এর মধ্যে সিঙ্গাপুরকে নিয়ে গালিগালাজ শুরু হয়ে যায়। আমরা বলতে থাকি, ওরা জানে না, ওরা পাষাণ, পিশাচ, ওরা পারলে এখনই কোলন কেটে রেখে দিত। ডাক্তার ভীচকে তখন আমার অনেক আপন মনে হলো। লোকটার বয়স এবং চেহারা অনেকটা আমার বাবার মতো।

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, এই রোগটা ধরা পড়ার পর আমি ইন্টারনেটে মোটামুটি পিএইচডি লেভেলের একটা রিসার্চও করে ফেলেছি। আমি এটুকু জেনেছি যে, স্টেজ ফোর থেকে শুধু কেমোথেরাপি দিয়ে ভালো হওয়ার কথা না। আমি আবারও ইন্টারনেট থেকে যা জেনেছি তা ডিটেইল এক্সপ্লেন করলাম। তাহলে ডাক্তার ওকে সার্জারি করছো না কেন ? তখন সবচেয়ে খারাপ সত্যটা আমরা বুঝতে পারলাম। হুমায়ূন আহমেদ আসলে সার্জারি করার মতো অবস্থাতেই নেই। হুমায়ূন সাহেব আমার শাশুড়িকে এই বিষয়টি জানাতে নিষেধ করলেন। বললেন, তারা এটুকু জেনেই খুশি থাকুক যে অপারেশন ছাড়াই আমার চিকিৎসা হবে। যাই হোক তারপর কেমো চলতে লাগল, চারটা খেরাপি গেল। ক্যাটস্ক্যান হলো, অস্বাভাবিক ভালো রেজাল্ট। তার টিউমারগুলোর সাইজ প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে এবং ডাক্তার খুব হ্যাপি হয়ে বলল, কনগ্রাচুলেশনস ড. আহমেদ, ইয়োর থেরাপি ইজ রেসপন্ডিং।

আমরা আকাশ থেকে পড়লাম। কেমো কাজ করছে এতেই ডাক্তার এত খুশি! তখন আমরা জানলাম স্টেজ ফোর এ

৪০ শতাংশ রোগীর শরীরেই কেমোথেরাপি কাজ করে না। ক্যাটস্ক্যান-এর রিপোর্টে আমরা খুব আশাবাদী হলাম। ভাবলাম যেখানে চারটা কেমোথেরাপিতে টিউমার প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে তাহলে আরও চারটা থেরাপির পর হয়তো টিউমার এতই ছোট হয়ে যাবে যে সার্জারি করাই লাগবে না। পাঁচ নম্বর কেমোর পর আমরা হাসপাতাল চেঞ্জ করলাম। বেলভিউ হাসপাতালে গেলাম। তার দুইটা কারণ, এক. ওই হাসপাতালটিতে শ্লোন ক্যাটারিং থেকে তুলনামূলক কম খরচ। দুই যে ডাক্তার আমাদেরকে এখানে চিকিৎসা করাচ্ছেন, তিনি প্রথম থেকেই প্রতিটা কেমোর সময় বলছেন, এই কেমো তোমরা সিঙ্গাপুর থেকে নিতে পারো, ইন্ডিয়া থেকে নিতে পারো, এমনকি তোমার দেশে বসেও নিতে পারো। রেগুলার কেমোথেরাপি, নাথিং স্পেশাল।

মাজহার যোগ করে,

ডাঃ ভীচ আরও বলেছিল শ্লোন ক্যাটারিং প্রাইভেট হাসপাতাল। এখানে ইন্সুরেন্স ছাড়া কেউ চিকিৎসা করায় না। কেন শুধু শুধু এখানে বেশি টাকা খরচ করবে।

হুমায়ূন আহমেদ বলেন,

তৃতীয় কেমোর পর আমার শরীরে হোয়াইট ব্লাড সেল কমে গিয়েছিল। তখন সেটা বাড়ানোর জন্যে একটা ইনজেকশন দেয়া হয় যার দাম ৭ হাজার ডলার। আর সেটা শুধু পুশ করার জন্যে দিতে হলো আরও ৩৮৮ ডলার, মানে প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এখানে আর না। কেমো দেওয়ার জন্যে হাসপাতাল খোঁজা শুরু হলো। বিশ্বজিৎ বের করল বেলভিউ হাসপাতালের খবর। ডাঃ ভীচ শুনে বললেন, বেলভিউ অনেক ভালো হাসপাতাল। তোমরা যেতে পার।

ওখানে কিন্তু আমাদের ডাক্তার পছন্দ করার সুযোগ নাই। রেজিস্ট্রেশন করার পর অনেকটা লটারির মতো ডাক্তার রোগীর ভাগে পড়ে। আমাদের ভাগে পড়ল একজন অল্পবয়েসী ইন্ডিয়ান ডাক্তার। অনেক দ্রুত কথা বলে ওই মেয়েটা।

সে বলে এখানে আমাদের দুই দিন থাকতে হবে। আগে কেমো দেওয়ার পর একটা পোর্টেবল ডিভাইস গায়ের সঙ্গে

লাগিয়ে দিত, যেখানে থাকত 5FU, সেটা নিয়ে আমি বাসায় চলে যেতাম। কিন্তু এই বেলভিউ হাসপাতালে পোর্টেবল ডিভাইস নেই, তাই হাসপাতালে থেকে 5FU দিতে হবে। আমি ডাক্তারকে বললাম, এটাই নাই ? তাহলে তোমাদের হাসপাতালে কোন বা...টা আছে ? কথাটা বললাম বাংলায়। আমি কিন্তু ইংরেজিতে ওদের সঙ্গে কথা বলি না। আমি শাওনকে বলি, শাওন ওদেরকে ইংরেজি বোঝায়। ভাব দেখাই যে আমি ইংরেজি জানি না। শাওন আমার এই কথার তর্জমা করে না। মজার ঘটনাটি ঘটল খানিক পরে। ওখানে ডাক্তাররা নিজে এসে পেশেন্টকে লবিতে পৌঁছে দিয়ে যায়, তার নেক্সট অ্যাপয়নমেন্ট কবে এবং সে তাঁর অ্যাসিসট্যান্টকে বলে, ডক্টর আহমেদ আবার এত তারিখে আসবে, তাঁর এই টেস্ট করা লাগবে, তো এই ডাক্তার আমাদেরকে যখন লবিতে ফেরত দিতে এসে বলল। ইউ আর ফ্রম ঢাকা ? মাই গ্রান্ড প্যারেন্টস ওয়ার্কড ইন নারায়ণগঞ্জ ফর থার্টি ইয়ার্স। হায় হায়! বলে কী ? এই মেয়ে বাংলা বোঝে না তো ? এ চিন্তা যখন করছি তখনই ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে বলে—আই আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি।

শাওন সান্ত্বনা দেয়, স্যার, ওটা তো হিন্দি শব্দ, ওরা তো এর অন্য মানে জানে। সে ঠিকই বুঝছে—বলেন হুমায়ূন। না হলে এমন কটমট করে তাকাবে কেন ? যাক। শাওন আবার গল্প শুরু করে—

প্রথম চারটা কেমোতে আমরা যেরকম সফলতা পেলাম দ্বিতীয় চারটায় আমরা সেরকম সফলতা পেলাম না। ওর টিউমার ছিল সবচেয়ে বড়টা থ্রি মিলিমিটার, প্রথম চারটার পরে হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিলিমিটার। দ্বিতীয় চারটার পরে হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার। মানে খুব কম ছোট হচ্ছে। আমরা হতাশ হয়ে গেলাম। সবগুলো রিপোর্ট নিয়ে স্লোন ক্যাটারিং-এ ডা. ভীচের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার সঙ্গে মাজহার ভাই এবং পূরবীদি। আমাদেরকে খুব সুন্দর করে অ্যাটেন্ড করল। সব রিপোর্ট দেখে সে বলল, না না ট্রিটমেন্ট ভালো হচ্ছে, বলল যে, দেখো রেসপন্স করছে দ্যাট ইজ ইমপরট্যান্ট। যদি একেবারেই না কমতো তাও আমি বলতাম গুড, বাড়ছে না এটাই গুড, সেখানে তোমার কমেছে। আমি বললাম, তোমাদের এখান থেকে ওদের ওখানে গিয়ে কি আমরা ভুল করেছি ? ও বলল, না না মোটেও না। একই কেমো দেওয়া

হচ্ছে। কমছে এটাই ইমপরটেন্ট। আমি বললাম, তাহলে কি আমরা ওষুধ চেঞ্জ করব ? নাহ, এই ওষুধ তো রেসপন্স করছে। নতুন ওষুধ তো রেসপন্স না-ও করতে পারে। আগের ওষুধটাই চলবে। কয়টা ? আরও চারটা। একই কথা বেলভিউ হসপিটাল বলেছে। আমি বেশ আপসেট। আটটা কেমোর পর আমি যখন ওর সিটিস্ক্যান করতে যাব, হুমায়ূন আহমেদ তখন খুব ডিপ্রেশনে ভুগছিল। হুমায়ূন আহমেদ বারবার বলছিল, চলো দেশে চলে যাই, আমি আর নিতে পারছি না। তাঁর আঙুলগুলো সব নাম্ব হয়ে গেছে। সে লিখতে পারে না, খেতে পারে না, নিজের হাত দিয়ে নলা ধরতে পারে না, সে মাছ খেতে পারছে না, কারণ সে মাছ বাছতে পারে না, তার হাত একদম অবশ হয়ে গেল, সে বোতাম লাগাতে পারে না, সে জুতার ফিতা লাগাতে পারে না। বারবার বলত, চলো, দেশে ফিরে যাই, চলো দেশে ফিরে যাই।

হুমায়ূন বলেন,

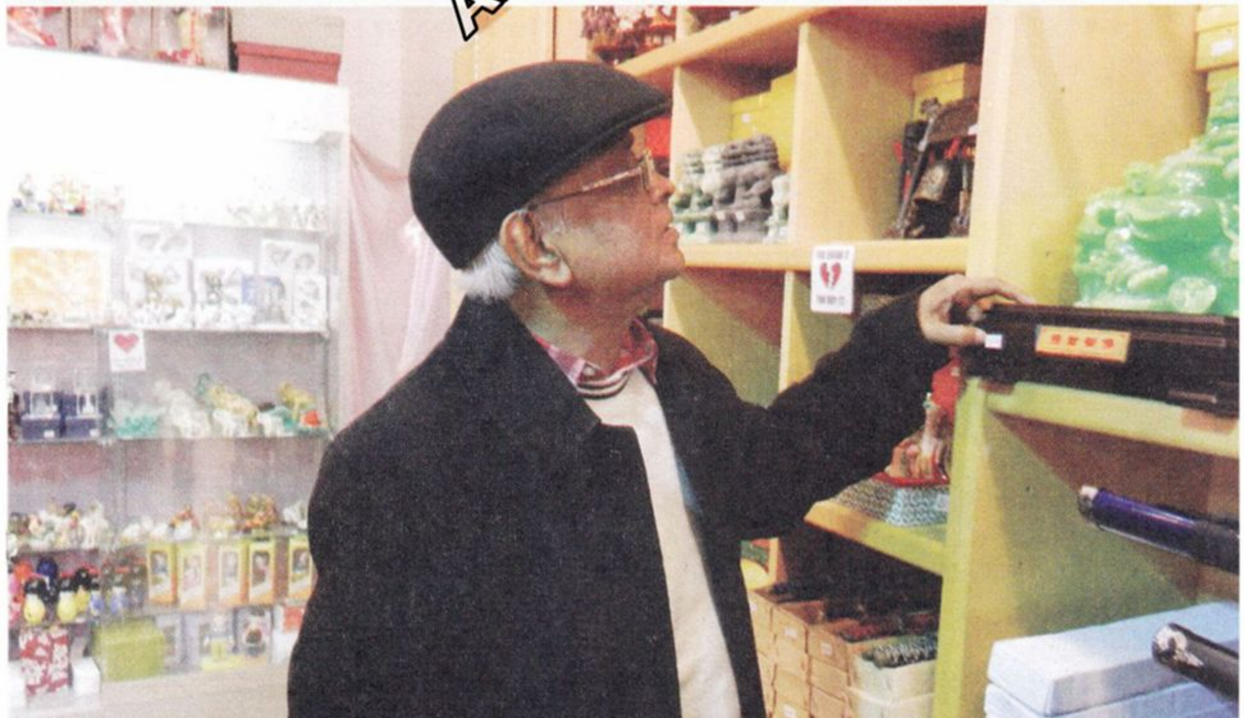
মানসিক অবস্থা সে সময় হয়েছে কী, কুসুম আমার বোতাম লাগায়ে দিত, আমার ভাত খাওয়ায়ে দিত, আমার যে খুব একটা সমস্যা হচ্ছিল তা না, কিন্তু আই মাস্ট বি ভেরি আপসেট, যে নাথিং ইজ রেসপন্ডিং। আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে এবং মে বি আই অ্যাম গোয়িং টু ডাই। এটা মাথার মধ্যে এলে, দুটো বাচ্চার দিকে তাকাতাম, মনটা খুবই খারাপ হতো। এলাম আমেরিকাতে। এসে একটা ঘরের মধ্যে আমার জীবনটা বন্দি হয়ে গেছে। শুধু যে আমি বন্দি হয়েছি তা না, আমার বাচ্চা দু'টোকেও আমি বন্দি করে ফেলছি। এরা ঘর থেকে বেরোতে পারে না শীতের জন্যে। আমি আমার স্ত্রীকে বন্দি করে ফেলেছি। আমি অসুস্থ ফাইন—এটা আমার জন্যে ফেইট, কিন্তু বাচ্চাগুলো তো অসুস্থ না। আমার স্ত্রী তো অসুস্থ না। হোয়াই দে আর সাফারিং ? এটা আমাকে খুবই পেইন দিল। আরেকটা জিনিস হইছে, শুধু শুধু লোকজন আসা শুরু হইছে, মাজহার বউ বাচ্চা ব্যবসা ফেলে বসে আছে। আমার শাশুড়ি গেছে দুই-তিনবার, নাসির গেছে জাপান থেকে, আমাদের মাসুম গেছে বাংলাদেশ থেকে একবার। খোকন সিঙ্গাপুর থেকে দেখতে এসেছে।

হুমায়ূন বলেন, এটা আমি বোঝাতে পারব না। হাউ পেইনফুল ইট ইজ!

শাওন বলে,

তখন আমি তাকে একটা, খুবই হাসি মুখে একটা মিথ্যা কথা বললাম। বললাম, দেখো আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি তোমাকে আর একটাও কেমো নিতে দেব না। আট নম্বর কেমোর সময় বললাম, এবারে কেমোর পরে তোমার টেস্ট যখন দেখবা...দেখবা কিচ্ছু নাই...সব ক্লিন হয়ে গেছে। আমি একদম হাসতে হাসতে তাকে বললাম। উনি বললেন, তুমি যখন বলছো তাহলে মনে হয় আমাকে আর কেমো নিতে হবে না। আমি বললাম, আমি তোমাকে অ্যাশিউর করছি এই আটটার পরে তোমাকে আর কেমো নিতেই হবে না। যখন ডাক্তার বলল আটটার পর আরও চারটা কেমো দিতে হবে। সে আমার দিকে অবাক হয়ে বলল, 'নাথিং ইজ হ্যাপেনিং'। ও ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করার চেয়ে আমাকে বলল, 'তুমি যে বললে আমাকে আর কেমো নিতে হবে না!' ভাবখানা এমন যে আমার হাতেই কেমো। এটা আমার জন্যে যে কী লজ্জার মোমেন্ট ছিল ! আমি বললাম, সরি আমি ভুল করে ফেলেছি...আর মাত্র চারটা। বাই দিস টাইম আমি জেনে গেছি বারোটার পরে আর কেমো নেওয়া সম্ভব না। মাজহার ভাই আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। নয় নম্বর কেমোর জন্যে হুমায়ূন আহমেদকে হসপিটালে ভর্তি করে আমরা আবারও গেলাম স্লোন ক্যাটারিং-এ ডাক্তার ডাঃ ভিচ-

নিউইয়র্কের এক গিফট শপে হুমায়ূন আহমেদ। ছবি : মাজহারুল ইসলাম



এর কাছে। যাকে আমি বলি আমার বাবার মতো দেখতে, আমার বাবার মতো ব্যবহার। অপারেশন হবে কি-না এটা আলাপ করার জন্যে যাব। আর কিছু নতুন থেরাপি আমি ইন্টারনেটের কল্যাণে লোকালাইজড অ্যাম্বুলাইজেশন-এর কথা ইতিমধ্যে জেনেছি। প্রতিটা টিউমারকে ইউরেনিয়াম দিয়ে ওরা একটা একটা করে ধ্বংস করবে। খুবই এক্সপেনসিভ নতুন ধরনের ট্রিটমেন্ট। আমাকে কিছু কথা বলল যেগুলো খুবই ফ্রাসটেটেড। বললেন, হি মাইট নেভার বিন এ ক্যান্ডিডেট ফর সার্জারি। তখন আমি বললাম, লোকালাইজড অ্যাম্বুলাইজেশনের কথা। বললেন, ওটাও সম্ভব না। এখানে একটা ঘটনা আছে। তার টিউমার মেজর বড় তিনটা আর ছোট ছোট অনেকগুলো। লিভারের এমন সব জায়গায়, যদি লিভারের এক জায়গায় থাকতো তাহলে লিভার কেটে ফেলে দিত অর্ধেক। তাঁর ক্যানসার কোলনে, সেটা ছড়িয়ে গেছে লিভারে। বড় টিউমারগুলো ছোট হচ্ছে, ছোট টিউমারগুলো বারবারই রিপোর্ট আসছে আনচেঞ্জড। বড়গুলো ছোট হচ্ছে, ছোটগুলো আরও ছোট হচ্ছে না কেন ? এমন কি হতে পারে এগুলো ক্যানসারাস না, কারণ একটা কেমোথেরাপির যে রেজিমেন্ট, সেটা কোনোটার উপরে কাজ করবে, কোনোটার উপরে কাজ করবে না তা হয় না। সে বলল, এটা প্রমাণ করার কোনো সুযোগ আমাদের হাতে নেই। পসিবল একটা পদ্ধতি আছে

প্রথম দফার চিকিৎসা কালে আটলান্টিক সিটিতে প্রকাশক ও বন্ধু মাজহারুল ইসলামের সঙ্গে



সেটা হচ্ছে সবগুলোকে বায়োপসি করা। তোমার হাজব্যান্ডের লিভারে অনেক স্পট, কয়টার আমরা বায়োপসি করব? ওইটা সম্ভব না। তার মানে আমার হাতে আর কিছুই নাই। ছোটগুলো কখনোই ভ্যানিশ হবে না। ভ্যানিশ না হলে সার্জারি করা যাবে না। সার্জারি করা না গেলে সম্পূর্ণ কিওর হবে না। আমি প্রশ্ন করলাম, তাহলে আমাদের হাতে কী অপশন? বলল, কেমোথেরাপি। আটটা নিয়েছে, আর চারটা নিতে পারবে। তারপর কী? তারপর ওরাল কেমো। তারপর কী? ডাঃ ভীচ জবাব দিল না। আমি পূরবীদিকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম। আমাদের আর কী করার আছে। পূরবীদি উনাকে জিজ্ঞেস করল। উনি বললেন, তারপর কী আমরা জানি না। বিশ্বের সব থেকে বড় ক্যানসার হসপিটাল বলছে তারপর আমরা আর জানি না। সেই মুহূর্তে আমার বাবার মতো চেহারার লোকটাকে মনে হলো যমদূত। তখন আমার মনে হলো এর কাছে এসে আমি ভুল করেছি। যে আমাকে পিঠ চাপড়ে বলত তোমার খারাপ লাগলে আমার কাছে আসবা। আমি বললাম, চলেন এখান থেকে চলে যাই। বেরিয়ে এলাম। হসপিটালের লবিতে বসলাম। ওখান তেকে আমাদের বেলভিউতে যাওয়ার কথা। আমি হাউমাউ করে কাঁদছি। মাজহার ভাইও কাঁদছে বলছে, পূরবীদি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মাজহার ভাই এক পর্যায়ে বললো, আপনি কান্না বন্ধ করেন। চলেন আমরা বেলভিউতে স্যারের কাছে যাই। খুবই একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেলাম যে আমাদের হাতে আর কোনো অপশন নাই। তারপরেও আমরা মিরাকেলের জন্যে অপেক্ষা করলাম। আরও চারটা কেমো দিল। আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর মিরাকল। এ হাসপাতালে প্রতি চারটা কেমোর পর ওদের সমস্ত রেডিওলজিস্ট, সার্জন, অনকোলজিস্ট মিলে একটা কনফারেন্স করে সমস্ত পেশেন্টদের ফাইল নিয়ে। ২৪ জন ডাক্তার একসঙ্গে বসেন। সেখানে কেমোর পর মেডিক্যাল বোর্ড বসল। আমরা অপেক্ষা করছি ডাক্তারের রুমে। একটু পরে রুমের দরজা খুলে সার্জন ঢুকল। ডাক্তারটির হাইট পাঁচফুট তিন ইঞ্চির বেশি হবে না। চেহারার মধ্যে স্টিফেন হকিন্স-এর মতো প্রতিবন্ধী ভাব আছে। 'মিস্টার আমেদ' বলে সে হাত বাড়ায়ে দিল হুমায়ূন আহমেদের এক বন্ধুর দিকে। কারণ তিনি দেখতে রোগা শুকনা। ভাবল সে-ই ক্যানসারে আক্রান্ত। তিনি বলেন, না

আমি পেশেন্ট না। পেশেন্ট ও। ও মিস্টার আমেদ। ডাক্তার বসল। তার হাতে মোবাইল ফোন, সে পা নাচাচ্ছে আর মোবাইলের বোতাম টিপছে। তার নাম ড. জর্জ মিলার। এই লোকটি মোবাইল টিপতে টিপতে হুমায়ূন আহমেদকে প্রথম যে কথাটি বলল, সেটা হচ্ছে ড. আহমেদ, আই সাসপেক্ট ভেতরে যে ছোট ছোট স্পটগুলো আছে সেগুলো হয়তো বা ক্যানসারাস না। আমি ভাবছি তোমার একটি স্পেশাল এম আর আই করব। বলে আবার মোবাইল টেপায় ব্যস্ত হয়ে গেল। আচ্ছা তোমার একাটা কোলনোস্কোপি করা দরকার। আবার মোবাইল টিপছে। তোমার একটা সিটি স্ক্যান্ মনে হচ্ছে করা দরকার। আবার মোবাইল টিপছে। আমি একটু কনফিউজড। লোকটা মোবাইল টিপছে কেন ? সে তো আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। কিছুক্ষণ পর তার মোবাইল টেপার রহস্য উন্মোচিত হলো। সে যে সকল টেস্ট করার কথা বলছে, তা সঙ্গে সঙ্গে মেইল করে দিচ্ছে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে এবং ইমিডিয়েটলি অ্যাপয়েনমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাট লিস্ট তিন মাসের কমে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব না। আমরা চাইলেও সম্ভব না। সে যে কতখানি প্রফেশনাল! এখানে আমাদের সঙ্গে কথা বলে সে বের হওয়ার পর ডক্টর আহমেদের কথা তার মাথায় থাকবে না। নতুন পেশেন্টের কথা থাকবে। আহমেদের সব তথ্য তার আই ফোনে আছে, সময়মতো আই ফোন তাকে মনে করিয়ে দেবে।

সে বলল, তোমার টেস্টগুলো শেষ হলে আগামী সপ্তাহে আবার তোমার সঙ্গে বসব। শোনো তোমাকে নিয়ে আমার দুটো অপশন আছে। এর মধ্যে সে স্পিকার অন করে আমাদের অনকোলজিস্টকে ফোন করলো। ড. আহমেদ আমার সামনে আছে, তুমি আমার ফোনে আছ। আমি তার এই এই অর্ডার দিয়েছি। এর মধ্যে আমি যদি দেখি এমআরআই রিপোর্টে তাঁর লিভারের স্পটগুলো ক্যানসারাস না, তাহলে সার্জারি করব। আর যদি ড. আহমেদ ততটা আনফরচুনেট হয় এগুলিও ক্যানসারাস তাহলে তো সার্জারি করতে পারব না। আমরা নতুন ধরনের আউট অব দ্য বক্স ধরনের ট্রিটমেন্ট করব যেটার নাম পাম্পিং থেরাপি। হেপাটিক আর্টারি থার্টি পারসেন্ট ব্লাড নেয় আরেকটা হচ্ছে ভ্যাসকুলার আর্টারি যেটা সেভেন্টি পার্সেন্ট নেয়। থার্টি পারসেন্ট যে আর্টারিটা ব্লাড দেয় সে

আর্টারিটা সে বন্ধ করে দেবে। আর সেভেন্টি পার্সেন্ট যে আর্টারি ব্লাড দেয় সেখান দিয়ে লোকালাইজড একটা কড়া কেমো দেবে যেটা লিভারের ওইগুলাকে হিট করবে। এটাকে আউট অব দি বক্স ট্রিটমেন্ট বলছে।

হুমায়ূন আহমেদ তখন নড়েচড়ে বসেন। কথার ফাঁকে শাওনকে থামিয়ে বলেন,

ও কে, আমি রিস্ক নেব। আমি দুবছর বাঁচার পরিবর্তে রিস্ক নেব। মরে গেলে মরে যাব। আমি রিস্ক নেব। আমি ডাক্তারকে বললাম, এই থেরাপিতে আমি কি মারা যাব ? এ প্রশ্ন শুনে ডাক্তার মোবাইল ফোন টেপাটেপি বন্ধ করে এই প্রথমবারের মতো রোগীর দিকে তাকাল। এরপর সে মাথাটা নিচু করে আবার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে বলল, ইফ আই ডু দ্যা সার্জারি ইয়োর চান্স অফ ডেথ ডিউরিং দ্যা সার্জারি ইজ জিরো পার্সেন্ট।

শাওন বলে,

আমি এটুকু জানলাম, এই মুহূর্তে সে মারা যাচ্ছে না, এবং আবার নতুন করে আল্লাহকে ডাকা শুরু করলাম। সাতটা দিন নতুন যে যে টেস্ট হওয়ার কথা সে টেস্টগুলো করালাম। আমার লাকি একটা ফতুয়া পরে গেছি। আগের সপ্তাহে এটা পরার পরে শুনেছি যে সার্জারির চান্স ভালো। সেইটাই পরে গেলাম। আগের সপ্তাহে হুমায়ূন আহমেদের সাথে ফানসু ভাই গেছে, ফানসু

নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শিশু পুত্রের সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ। ছবি : মেহের আফরোজ শাওন



ভাইকে নিয়ে গেলাম। আমরা ডাঃ মিলার-এর রুমে অপেক্ষা করছি। ডাক্তার ঢুকে বলে, ড. আহমেদ জুনের বারো তারিখে তুমি ফ্রি আছ ? মানে ? জুনের বারো তারিখে তোমার সার্জারি হবে। আমি বললাম, ছোট ছোট স্পটগুলো ? ও নো নো, আই অ্যাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর দে আর নট ক্যানসারাস।

হুমায়ূন আহমেদ চিৎকার করে বলেন,

থ্যাঙ্কস গড আই ডিড দ্য এমআরআই। এ খবর শুনে শাওন কাঁদতে শুরু করল। ডাক্তার বলল, 'হোয়াই শি ইজ ক্রাইং ? হোয়াই দিস লেডি ক্রাইং ?

শাওন বলে,

আমি তো খুশিতে কাঁদছি। ডাক্তার আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, নো রিস্ক নো রিস্ক...নো লাইফ রিস্ক ডিউরিং সার্জারি। আমি ওকে বললাম, ড. ইউ আর লাইক এ প্রোফেট টু আস। তুমি আজকে আমাদের যে কথাটা শোনালে আমার মনে হয় না আমি এর থেকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত কথা শুনছি। সে আমাকে তার মোবাইল থেকে অপারেশনের কী কী সাইড ইফেক্ট হতে পারে দেখাল। সাইড ইফেক্টে ওর লিভার অকেজো হয়ে যেতে পারে। তবে সে অকেজোটা ফর দ্য টাইম বিং, তারপরে ঠিক হয়ে যাবে। ফর দ্য টাইম বিং আশপাশের অর্গ্যানগুলো অবশ হয়ে যেতে

নিউইয়র্কে চিকিৎসার ফাঁকে বাল্টিমোর হারবারে সপরিবারে হুমায়ূন আহমেদ ও মাজহারুল ইসলাম



> পারে। লিভার কলাপস করতে পারে। তারপরে আমরা তাকে বললাম, তাহলে কি আমরা এখন দেশে যেতে পারি ? সে বলল, ও দিজ ইজ দ্য রাইট টাইম। আমি তো বারো তারিখ পর্যন্ত তোমাকে কিছু করব না। তবে জ্বর হলে, ইনফেকশন হলে, তুমি যদি এমন কারও সঙ্গে মিট করো যে অসুস্থ যার ফ্যামিলিতে কেউ অসুস্থ তোমার অপারেশন ক্যান্সেল। তোমার হাত-পা বা কোনো জায়গায় যদি আঁচড় পড়ে বা কাটে, তোমার যদি ডায়াবেটিস বাড়ে, তোমার যদি কিডনির প্রবলেম থাকে, তোমার যদি হার্টের প্রবলেম থাকে, তা হলে তোমার অপারেশন ডেট ক্যানসেল। তাহলে আমাদের এখন কী করতে হবে ? সুস্থ হার্ট, সুস্থ কিডনি, হাত পা কোথাও কাটে নি, নুহাশপল্লীতে কোথাও স্যান্ডেল খুললে আমি ভাবছি পাটাই কেটে দেব। স্যান্ডেল খুলতে দেই নাই। সুস্থভাবে ফেরত নিয়ে যাব কথা দিয়ে আসছি ডাক্তারকে। জর্জ মিলারকে বলেছি যেভাবে নিয়ে যাচ্ছি তার থেকে হেলথ ভালো করে নিয়ে আসব। হিমোগ্লোবিন একটু হলেও বাড়িয়ে নিয়ে আসব এবং আমরা যখন যাব ওরা টেস্ট করবে এবং দেখবে হুমায়ূন আহমেদের হিমোগ্লোবিন বেড়ে গেছে [বলেই একটা চিৎকার দিয়ে ওঠে] ই......য়া.....হু!

এভাবে চিকিৎসা-বিরতিতে নুহাশপল্লী দেখতে এসে হুমায়ূন আহমেদের চিকিৎসার গল্প শোনালেন। তিনি নানা ধরনের রসিকতা করলেন।

একনাগাড়ে এ গল্প বলার পর আসর ভাঙে খানিকক্ষণের জন্যে।

নুহাশপল্লীতে এখন তাঁর সঙ্গে আছেন মা আয়শা ফয়েজ আর বোন শেফু, কিছু বন্ধুবান্ধব। গত ২ দিন সাংবাদিকেরা খুব বেশি উৎপাত করেন নি। আজ তৃতীয় দিনে দু'টো টেলিভিশন ক্যামেরা পাঠিয়েছে। তারা অপেক্ষা করছে বাইরে। কাল চলে যাবেন ঢাকার *দখিন হাওয়ার* ফ্ল্যাটে। আমি বিকেলবেলা চলে আসতে চাইলাম। স্যার আমাকে ছাড়বেন না। বলেন, থাকো, কাল একসঙ্গেই যাব। বললাম, স্যার, আজ আমাদের ম্যারেজ ডে।

শাওন ছিল পাশে। প্রায় চিৎকার করে বলে, আপনার ম্যারেজ ডে, আর আপনি এখানে ? যান, যান, তাড়াতাড়ি ভাবির কাছে যান। খোদা হাফেজ, আমরা কাল আসছি। ঢাকায় দেখা হবে।



সন্তানদের নিয়ে নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদ। ছবি : মাসুদ আখন্দ

নুহাশপল্লীতে তাঁর শেষ ক'টি দিন

মাত্র কুড়ি দিনের জন্যে চিকিৎসা-বিরতির ছুটি পেয়ে এসেছিলেন দেশে। ১১ মে ২০১২ বিমানবন্দর থেকে নেমেই প্রিয় নুহাশপল্লীতে চলে গিয়েছিলেন। ঢাকা ফিরলেন ১৪ মে। আবার ২২ মে চলে গেলেন নুহাশপল্লী। আরও ২-৩ দিন থেকে ২৫ মে ফিরে আসবেন ঢাকায়। ২৯ মে পর্যন্ত থাকবেন দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে। বাকি থাকে দু'রাত। সে দু'রাত একেবারেই একান্তে কাটানোর জন্যে, বিশেষ করে গুণগ্রাহী ও সাংবাদিকদের থেকে দূরে থাকার জন্যে থাকবেন গুলশানে শ্বশুরবাড়িতে। তারপর অপারেশনের জন্যে আমেরিকা যাত্রা।

১৪ মে থেকে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের দেখা হয়েছে। কখনো দিনে একবার, কখনো দু'বার। প্রায় প্রতিরাতেই রাতের খাবার খেতে হতো দখিন হাওয়ায়, কখনো কখনো দিনের বেলাও। যে ক'দিন দেশে ছিলেন, তাঁদের নিজের চুলায় হাঁড়ি বসাতে হয় নি। বন্ধুবান্ধব, স্বজনরা রুটিন করে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন বাসায়। খাবারের পরিমাণ—এলাহি কাণ্ড। দশ পদের নিচে কেউ খাবার পাঠান না। বেশির ভাগই নিজের হাতে রেঁধে, কেউ কেউ নামিদামি হোটেলের খাবারও পাঠিয়েছেন। কেবল নুহাশপল্লীতে যে ক'দিন ছিলেন, সে ক'দিন তাঁর বাবুর্চি রেঁধেছে। গরুর মাংস, মুরগির মাংসের বাইরেও তাঁর প্রিয় জিয়ল মাছের একটা তরকারিও সব সময় থাকত।

দখিন হাওয়ার সময়টা তিনি দিনের বেলা একান্তে কাটাতে পারতেন। এ সময় বারান্দায় বসে বসে বই পড়তেন, কিংবা ছবি আঁকতেন। এর মধ্যে একটা টেলিফিল্মের চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং দেশ ছাড়ার দু'দিন আগে এর প্রযোজক ও পরিচালককে পড়িয়ে শুনিয়েছেনও। তাঁর শেষ উপন্যাস 'দেয়াল' নিয়ে আদালতের নজরে আনা হয়। *প্রথম আলো*-তে এর দু'টো অধ্যায় ছাপা হয়েছিল মাত্র। এবিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে তাঁকে একটা বিশাল আকৃতির বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার পেপার বুক পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করা হয় এ নথিটি অনুসরণ করার জন্যে। শেখ রাসেলকে হত্যা করার আগে সে ভাবির কাছে লুকিয়ে ছিল, না কাজের ছেলে রমার কাছে লুকিয়ে ছিল—এটা নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি ঘটেছে। তাঁর কাছে যে দু'টো বই আছে সেখানে লেখা ভাবির কাছে, সরকারি নথিতে আছে কাজের ছেলের কাছে। এসব নিয়ে প্রতিদিনই বেশ কিছু লোক তাঁকে নানা রকম পরামর্শ দিতেন। আর মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন। নিউইয়র্কে বসে বেশ ক'টি ছবি আঁকা হয়েছিল তাঁর—এগুলো নিয়ে

একটা প্রদর্শনী হবে জুন মাসের ২৯ তারিখে নিউইয়র্কে। সেটার ক্যাটালগ তৈরি, নতুন ছবি আঁকা, নিউইয়র্কের ডাক্তার কখন কী বলল, সে সবের কাহিনি শোনানো—এমন করেই তাঁর দিনরাত্রি কেটে যাচ্ছিল।

তিনি নুহাশপল্লী বা দখিন হাওয়া, যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা আর বোন, শিখু আপা। মা'র একটা গল্প প্রায়ই শোনাতেন। আমেরিকায় তিনি যখন চিকিৎসাধীন, তখন মা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে পাঁচ হাজার ডলার পাঠিয়ে দিয়েছেন ছেলের চিকিৎসার জন্যে। মা'র এ টাকা পাঠানোর বিষয়টিই মূলত তাঁকে অনেক বেশি আবেগাপ্লুত করে। সিদ্ধান্ত নেন, দেশে যে ক'টি দিন থাকবেন, মাকে সঙ্গে নিয়েই থাকবেন।

২৪মে আমি আর আলমগীর ভাই একসঙ্গে রওয়ানা দেই নুহাশপল্লীতে। সপরিবারে মাজহার ও কমল চলে গেছে আগেই। তাদের সঙ্গে আলমগীর ভাইর স্ত্রী ঝর্ণা ভাবিও আছেন। আলমগীর ভাই তাঁর নিজের বিছানা ছাড়া রাতে ঘুমাতে পারেন না, আর রাতে কখনো একা চলতে পারেন না। একারণে তাঁর যাওয়া হয় নি। আজ ভোরেই রওয়ানা দেবেন আমাকে নিয়ে। আমি রাতে থাকব না, ঢাকা ফেরত আসব। তাঁর অনেক খুশি, রাতে তিনি আমার সঙ্গে ফিরবেন।

আমরা দুপুরবেলা পৌঁছাই। বেশ নিরিবিলি পরিবেশ। সাংবাদিক নাই, ক্যামেরা নাই। কোনো একটা নাটকের শুটিং ছিল আজ, সেই নাটকের শুটিংও শেষ হয়েছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। আকাশে চাঁদ, কখনো

নুহাশপল্লীর মাঠে স্বজনদের সঙ্গে ইফতারি করতেন হুমায়ূন আহমেদ (ছবি : মাসুদ আখন্দ)



মেঘ, কখনো বৃষ্টি। এক সময় বৃষ্টির মাত্রা বেড়ে গেল অনেকগুণ। হুমায়ূন আহমেদের বেডরুমেই আমরা সবাই বসে। আলমগীর ভাই উশখুশ শুরু করেন। এখনই না বেরোলে দেরি হয়ে যাবে। অন্তত তিনঘণ্টা সময় লাগে ঢাকা যেতে। তিনি আমাকে নিয়েই যেতে চান—ড্রাইভার এসে খবর দিয়েছে। হুমায়ূন আহমেদ ড্রাইভারকে জানালেন, শাকুর যেতে চাচ্ছে না, তাঁকেও থাকতে বলছে।

এরপর তাঁর কোনো খবর নাই। আমরা বৃষ্টি দেখি, জ্যোৎস্না দেখি, চাঁদ দেখি, মেঘ দেখি। বৃষ্টি ও জ্যোৎস্না একসঙ্গে দেখা যায় না। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, এই জ্যোৎস্না ও বৃষ্টির বিলাসীর জন্য আজ এ দু'য়ের একত্র সংগম ঘটছে। ঘটনাটা অন্য রকম। বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, হুমায়ূন আহমেদ তার বেডরুমের দরোজা খুলে রেখেছেন। দরোজার পরেই বারান্দা। সেই বারান্দার পরে চল্লিশ ফুট দূরে একটা লাইটপোস্ট। সেই লাইটপোস্টের বাতি জ্বলছে। বৃষ্টি ও অন্ধকারের জন্য ওই বাতিটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘরটির সামনে বেশ বড়সড় গাছ, সেই গাছের চিকন চিরল পাতার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলোর কিরণ চোখে এসে লাগছে তাকে জ্যোৎস্নার বৃষ্টির রাত বলেই মনে হচ্ছে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে শাওন গাইছে হুমায়ূনের মন ভালো করানো গান।

আমরা সবাই আলমগীর ভাইয়ের কথা ভুলে যাই। বৃষ্টি থামলে আলমগীর ভাইকে ফোনে পাওয়া যায়। তিনি তখন গাজীপুর চৌরাস্তা পার হয়ে গেছেন। বৃষ্টি থেমে গেছে খানিক আগে। আকাশে চাঁদ। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।

বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একসাথে খাবার খেতে পছন্দ করতেন হুমায়ূন আহমেদ





বৃষ্টি ও জ্যোৎস্নার রাত

জ্যোৎস্নাবিলাসী এ মানুষটির জ্যোৎস্নাপ্রীতির খবর কারো কাছে নতুন নয়। তাঁর সেই প্রথম উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার' থেকে শুরু করে শেষ জীবনের যে-কোনো লেখাতেই জ্যোৎস্নার কথা বলা থাকবেই। জ্যোৎস্না নিয়ে অনেকগুলো গানও আছে তাঁর। তাঁর নিজের লেখা মরণগীতিতেও তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে চন্দ্রালোকিত রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। চন্দ্রালোকিত রাতকে তিনি বলতেন 'চান্নি পসর' রাইত। 'চান্নি পসর' খাস নেত্রকোনার শব্দ। আমাদের সিলেটের সঙ্গে মিল আছে। আমরা বলি 'চান্নি রাইত'। এই 'চান্নি পসর' তাঁকে দেখিয়েছিল মামা বাড়ির এক লোক। বলছিল, ভাইগনা 'চান্নি' দেখতে অইলে আও আমার লগে। নেত্রকোনার বিশাল খোলা মাঠে ভরা পূর্ণিমা রাতে মামা বাড়ির লোক তাঁকে যা দেখিয়েছিল, সেটা তিনি ভুলতে পারেন নি। আর সে কারণেই, হাছন রাজা যেমন আউলা হতেন ভরা পূর্ণিমা দেখা হাওড়ে, হুমায়ূনকেও আউলা করতো জ্যোৎস্নার চাঁদ।

তাঁর জ্যোৎস্নাভোগের অনেক কাহিনি শুনেছি, কিছু তাঁর অনেক লেখাতেও পড়েছি। কিন্তু একসঙ্গে দেখা হয় নি তেমন। একবার ২০০৮ সালে ৫ দিনে সুন্দরবন সফরে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। অন্ধকার রাতে বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত ঘেঁষে একটা চাঁদ উদয় হওয়ার দৃশ্য দেখানোর জন্য আমাকে আমার কেবিন থেকে ডেকে এনে ছবি তুলতে বলেছিলেন। আমি আমার মতো ছবি তুলেছি, তিনি তাঁর মতো ঝিম মেরে বসে থাকলেন। এই আমাদের একত্রে চাঁদ দেখা।

নুহাশপল্লীতেও এক রাতে আমরা সবাই মিলে বসেছিলাম তাঁর ঘরের সামনের জাপানি বটের নিচে। হঠাৎ দেখা গেল আকাশে চাঁদ। আমি একটা বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়লাম। শুয়ে না পড়লে চাঁদ দেখা যায় না। ঘাড় বাঁকা করে চাঁদ দেখা বড়ই বিরক্তিকর। বিষয়টি দেখে তিনি মোস্তফাকে ডাকেন । বলেন—ওই কার্পেটটা এখানে বিছাও।

সঙ্গে সঙ্গে নুহাশপল্লীর ঘাসের উপর বিছানো হলো বিশাল কার্পেট। চলে এলো বালিশও। আমাকে আরাম করে চাঁদ দেখানোর জন্যে তার এই আয়োজন।

নুহাশপল্লীর স্টাফদের অনেক গুণ। শুধুই মালি-বাবুর্চি-দারোয়ান নয়। প্রত্যেকে যে এতদিনে পাকা অভিনেতা হয়ে গিয়েছে তা তার নাটকগুলো দেখেই জেনেছি। কিন্তু তারা যে গানও গাইতে পারে এটা জানতাম না। চন্দ্রালোকিত রাতে তারা

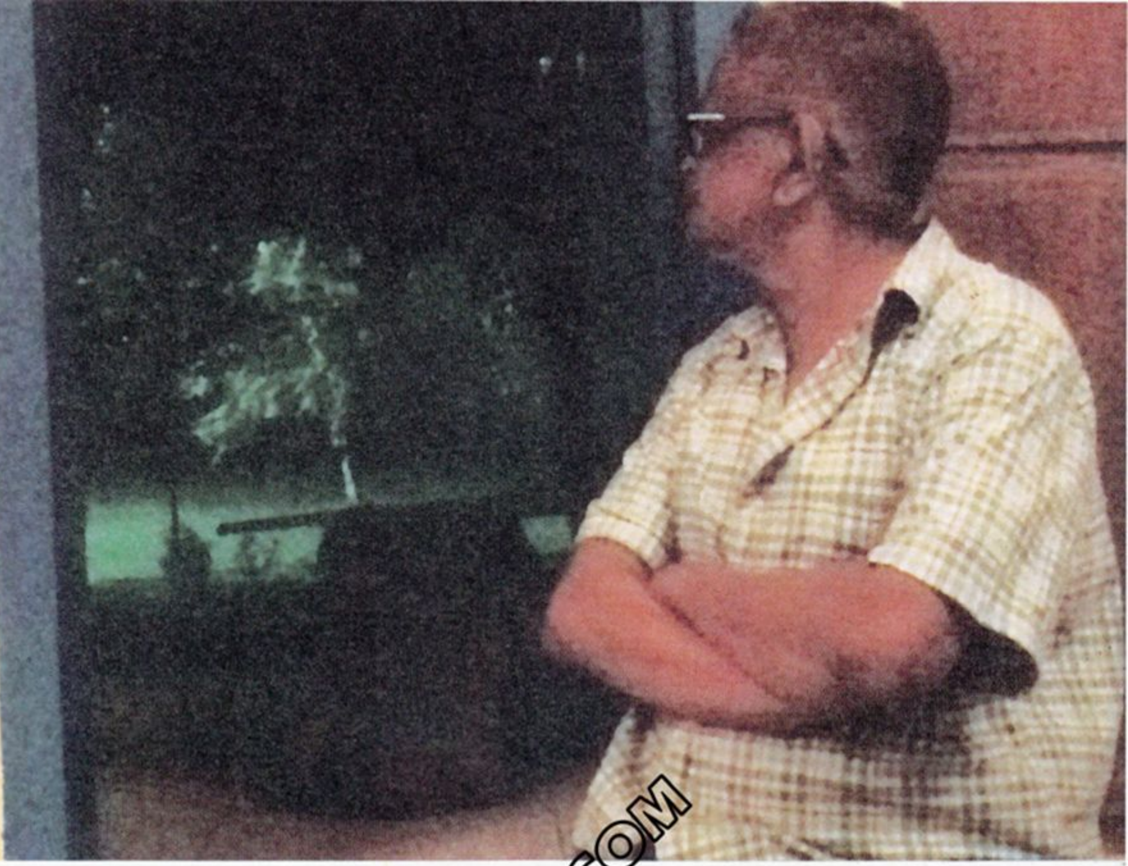
নুহাশপল্লীতে তাঁর শেষ বৃষ্টিমাখা রাত

হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোল, বাঁশি নিয়ে বসে পড়ে। স্যারকে গান শোনায়। তার বেশ কিছু স্যারের লেখা, বাকিগুলো স্যারের পছন্দের গান। কোনোটা হাছন রাজা, উকীল মুন্সি, রাধারমণ বা আবদুল করিমের।

আজকের রাতটিও অনেকটা সে রকম। কিন্তু এখন স্যারের শরীর খারাপ। তাঁর স্টাফদের মধ্যে সেই প্রাণচাঞ্চল্য নাই। সবাই মুখ বেজার করে আছে, কিসে স্যারকে তুষ্ট রাখা যায়, সেই চিন্তায়।

রাত প্রায় বারোটা হবে। আমাদের ৭-৮ জনের একটা দল রাতের বেলা নুহাশপল্লীতে হাঁটাহাঁটি করছি। সবার লক্ষ্য হুমায়ূন আহমেদ। তিনি যে দিকে হাঁটছেন, সবাই পিছু পিছু। এই দলে হুমায়ূন আহমেদ, সস্ত্রীক মাজহার আর কমল। আমি আর ঝর্ণা ভাবি। আমার স্ত্রী কেন আমার সঙ্গে এখানে নেই এটা সবাই জানেন, কেউ এখন আর এ নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করে না।

আমরা হুমায়ূন আহমেদকে অনুসরণ করে করে চলে আসি একেবারে দিঘি বরাবর। এখানে নতুন দুটো কটেজ বানানো হয়েছে স্থপতি মেহের আফরোজ শাওনের ডিজাইনে। নাম দেওয়া হয়েছে 'ভূত বিলাস'। যারা ভূত দেখতে নুহাশপল্লীতে আসবেন, তাদের জন্যে এখানে থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ভূত যদি থেকেই থাকে, তাহলে তো দেখবেনই, আর যদি না থাকে–তবে পয়দা করা হবে।



বেডরুম থেকে তন্ময় হয়ে দেখছেন বৃষ্টি ও জ্যোৎস্না

নুহাশপল্লীতে ভূত পয়দা করার কারখানা তৈরি হবে।

দিঘিটির পূর্ব পাশে একনাগাড়ে ৫-৬টি কটেজ হবে। আমরা তার একটির ভেতর প্রবেশ করি। এখানে কোনো ফার্নিচার বসে নি এখনো, ফার্নিচার ছাড়া সবকিছুর কাজ শেষ। ফিটিংস বসানো আছে। ঘরের ওপাশে দিঘির উপর কেন্ডিলিভার করে প্রশস্ত বারান্দা। এ বারান্দায় আমরা ৮জনই বসে পড়ি। হুমায়ূন আহমেদ একের পর এক চুটকি শোনাতে থাকেন, শাওনকে গান গাইতে বলেন। শাওনও গান গায়। সবই গীতিকার হুমায়ূন আহমেদের গান।

রাত প্রায় দুটো বাজে। হুমায়ূন আহমেদ একসময় সিগারেটের জন্যে মরিয়া ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের উপকরণের একটা ছিল এই সিগারেট। অথচ এখন একবারের জন্যেও সিগারেট নিয়ে উশখুশ করছেন না। আমেরিকা যাওয়ার পরপরই তিনি সিগারেট ছেড়েছেন। আমাদের দলে প্রায় সবাই [আলমগীর ভাই সদ্য দলছাড়া হয়েছেন] স্মোকার। এ দলে নেতৃস্থানীয় ছিলেন হুমায়ূন। এখন তিনিও 'আধূনিক'-এর সদস্য। সিগারেট খাচ্ছেন না। সামনে খেলে যদি তাঁর কষ্ট বাড়ে, এ আশংকায় আমরাও খাচ্ছি না। এটা দেখে তিনি অবাক হচ্ছেন। বারবার বলছেন, তোমাদের কী হলো, তোমরা খাচ্ছ না কেন? খাও খাও, আমার সমস্যা হচ্ছে না এখন। সিগারেটের নেশা আমার মাথা থেকে চলে গেছে। এটা যেমন বলছেন, আবার এ-ও বলছেন যে, সিগারেটে আসলে কোনো লাভ নাই। কিন্তু মানুষ যে কেন এটা খায়! নিশ্চয় কারণ



ভূতবিলাসের পেছনের এই বেলকনিতে ছিল রাতভর আড্ডা

আছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ এই জিনিসটার প্রতি আসক্ত। তাদের সবাই জানে যে এটা কাজের কাজ কিছুই করে না, কোনো লাভ নেই তার মধ্যে, তারপরও এটা পোড়ানোতে মানুষের এত আনন্দ।

রাত অনেক হয়ে গেছে। 'ভূত বিলাস' নিয়ে আরো কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ঠিক হয়, সামনের ১২ তারিখের অপারেশনের পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ফেরত আসার পর এগুলো কার্যকর হবে।

আমরা আস্তে আস্তে উঠে আসি। নিচের দিঘির পাড় থেকে একটা উঁচু টিলা বেয়ে উঠতে হয়। এই টিলা বাওয়া নিয়েও কত রসিকতা করেছেন তিনি। একবার দখিন হাওয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন এভারেস্ট জয়ী এম.এ. মুহিত। আমাদের সঙ্গেও অনেক কাচ্চা-বাচ্চা-তরুণ খুব আগ্রহ নিয়ে এভারেস্টের উপরে ওঠার কৌশল শিখতে চাইল মুহিতের কাছে। এক তরুণকে কাছে ডেকে বললেন, যাও, তুমি আগে নুহাশপল্লীর টিলাটা জয় করে আসো, তারপর এভারেস্টের খোঁজে যেয়ো।

আমরা সেই এভারেস্ট জয় করে সমতলে চলে আসি। সেখানে বিরাট মাঠ। পাশ দিয়ে ইট বিছানো হাঁটা পথ আছে। সেই পথে না গিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে থাকি। মাঠ পার হয়ে উপরের সীমানা প্রাচীরের কাছে কতগুলো লিচুগাছ। গাছগুলোর নিচে



শেষরাতে এই লিচুগাছের তলায় অনেকক্ষণ বসে ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ

গাছের গোড়াকে কেন্দ্র করে ঘোরানো প্লাটফর্ম। নুহাশপল্লীর ম্যানেজার বুলবুলকে বলেছিলেন, মারা গেলে যেন এখানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা কোনো কথাবার্তা বলি না। মহিলারা প্রায় সবাই ঘরের দিকে চলে যান। আমরা চারজন পুরুষ [হুমায়ূন, মাজহার, কমল আর আমি] এখানে কিছুক্ষণ বসি। নানা রকম কথাবার্তা বলি। আড্ডার সব কথা কি মনে থাকে! এক সময় শেষ রাতের দিকে আমরা যার যার ঘরে গিয়ে ঘুমাই।



নুহাশপল্লীতে তাঁর শেষ দিন

আমি আর কমল ড্রইংরুমের মেঝের উপর ঘুমিয়েছি। এ ঘরটি অনেক আরামের। কিন্তু আজ আরাম মনে হলো না। রাতে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল, ভোর পর্যন্ত এলো না। সে কারণে এ ঘরের ঠান্ডা নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি কাজ করছে না। গরমের ঠেলায় বেশ ভোরে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি শুয়ে শুয়ে পর্দা সরাতে গিয়ে পুরো পর্দাটাই ডাণ্ডাসহ ফেলে দিই। ঘর আর বাইরের মাঝখানে তখন কোনো বিভাজন নেই। যেটুকু আছে তা একখানা বড় কাঁচ। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত এই কাঁচের ফ্রেমগুলো ঠেলা দিয়ে সরানোর পর মনে হলো, আমি গাছপালার মধ্যেই শুয়ে আছি। আমার শরীর থেকে তিন ফুট দূরে গাছের পাতা।

একবার মনে হলো কেউ যেন দরোজা খুলল। আমি সাধারণত একটু দেরি করে বিছানা ছাড়ি, কিন্তু আজ মনে হলো নুহাশপল্লীতে এ তিন-চার-বছরে কতবারই না এলাম, কিন্তু খুব ভোরের কোনো দৃশ্য আমার দেখা হয় নি। আজ দেখব। আমি কমলকে পাশের বিছানায় ফেলে রেখে ধীরে ধীরে দরোজা খুলে বেরিয়ে পড়ি। দেখি, থ্রি কোয়ার্টার একটা প্যান্ট আর স্ট্রাইপ করা রাতে শোয়ার কারণে ভাঁজ খাওয়া একটা হাফশার্ট পরে হুমায়ূন আহমেদ গাছতলা দিয়ে একা একা হাঁটছেন।

ভোরের শিশির পড়ে নি ঘাসের ডগায়। কিন্তু গতরাতের বৃষ্টির রেশ রয়ে গেছে নরম সবুজ ঘাসের উপর। তার সঙ্গে ভোরের শীতল মিষ্টি হাওয়া। আমি জাপানি বটের নিচের বেঞ্চিতে বসে থাকি, হুমায়ূন পেছনে হাত দু'টো দিয়ে একা একা হাঁটছেন। কখনো বা কোনো কোনো গাছের পাশে গিয়ে তার আগাছা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, আবার একটু হাঁটছেন। যেন সবগুলো গাছের সঙ্গে তাঁর এখন দেখা করার কথা, গল্প করার কথা, সবার খোঁজ-খবর নেওয়ার কথা। আমার কখনো দেখার সুযোগ হয় নি, তবে নুহাশপল্লীর লোকজনের কাছে শুনেছি, তিনি নাকি গাছগুলোর সঙ্গে কথা বলতেন। গাছের পাশে গিয়ে বলতেন—এই ব্যাটা, তোর হয়েছেটো কী, বাড়ছিস না কেন ? ওরা কি তোর খাবারদাবার ঠিক মতো দেয় না ?

নিজের হাতে চারা লাগানো, গাছ লাগানো, বীজ বোনা এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে একটা চারাকে বৃক্ষে রূপ নেওয়ার সবগুলো স্তর তার নিজের দেখা, সন্তানের মতো মমতা দিয়েই বৃক্ষপ্রেমী এই মানুষটা একটা জঙ্গলকে উদ্যানে পরিণত করেছেন। আর সেকারণেই তাঁর নুহাশপল্লীতে বেড়াতে আসা যে-কোনো আগন্তুককে নিয়ে প্রথমেই তাঁর গাছপালার রাজ্য দেখানোতে তাঁর সবচেয়ে বড় আগ্রহ ছিল।

বেলা প্রায় ৭টা বাজে। আমি বসেছি সুইমিংপুলের পাশের একটা চৌচালা চালনির তলায়। এই স্ট্রাকচারটা অল্পদিন আগে হয়েছে। আমি গিয়ে ওখানে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর তিনিও এসে বসেন। আমাদের জন্যে দু'কাপ কফি আসে। দু'জনই আমরা চুপচাপ বসে থাকি, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলি না। এর মধ্যে হঠাৎ আমাকে বলেন, ওদেরকে নিষেধ করো, এখন না, পরে।

আমি পেছনে তাকিয়ে দেখিএকটা টেলিভিশন চ্যানেলের দু'টো ক্যামেরা আমাদের দিকে তাক করে আছে। এত ভোরে!

আমি মিষ্টি করে তাঁদের বলি—ভাইরা, একটু পর। এখন না। আজ তিনি কথা বলবেন। আপনারা রেস্ট নিন।

আমি তাঁদেরকে চা দেওয়ার জন্যে একজনকে বলি। তাঁরা ক্যামেরা ঘুরিয়ে গাড়ির ভেতর গিয়ে বসেন।

আমাদের কফি খাওয়া শেষ হয় না। নুহাশপল্লীর বিশাল গেটটা আবার খোলে। আরো একটা টেলিভিশন চ্যানেলের গাড়ি ঢুকছে। বেলা তখনো আটটা বাজে নি, ক্যামেরা চলে আসে ৪টা টেলিভিশনের এবং সকাল ন'টার মধ্যে ১০-১২টা।

গত রাতে আমি মাজহারকে ফোনে কথা বলতে শুনেছি। মাজহার বলছে, কাল স্যার কথা বলবেন সাংবাদিকদের সঙ্গে, হ্যাঁ, পাঠান, না অসুবিধা নাই, সকাল থেকেই স্যার ফ্রি আছেন, কালই ঢাকা ফিরবেন। ঢাকায় গিয়ে কিন্তু কথা বলানো যাবে না...এসব।

এর আগে হুমায়ূন আহমেদকে দেখেছি সাংবাদিকদের ব্যাপারে তিনি সব সময় উদাসীন। কথা বলতে চাইতেন না। কখনো কখনো কেউ কেউ কোনো প্রশ্ন করলে উল্টো জবাব দিতেন। একই প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন সাংবাদিকের কাছে বিভিন্ন রকমের

২৫ শে মে ২০১২। ভোরের নরম আলোয় নুহাশপল্লীর খেজুর গাছতলায় ছিল তাঁর শেষ পদচারণা



হয়ে যেত। সকাল ন'টার দিকে সাংবাদিকদের ঝাঁক দেখে তিনিও তৈরি হয়ে যান। তার মূল ঘরটির পাশে রট আয়রনের একটা গোলটেবিল, দু'পাশে দু'টো সিঙ্গেল চেয়ার, এক পাশে লম্বা চেয়ার বিছানো আছে। তাঁর বহু নাটক-সিনেমায় এ ফার্নিচারগুলো দেখা গেছে। তার একটা সিঙ্গেল চেয়ারে তাঁকে বসানো হয়। ক্যামেরাগুলো ঘিরে ধরেছে। প্রায় সবার একই রকমের প্রশ্ন। কয়েকটি প্রশ্নোত্তর ছিল এ রকম—

আপনার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র কোনটি ?

'হিমু'

এই হিমু আসলে কে ?

এইটা আমিই।

আর মিসির আলি ?

ওটাও আমি।

হিমুর সঙ্গে মিসির আলির দেখা করান না কেন ?

করাব।

আপনি কিছুদিন পর আমেরিকা যাবেন, হিমুর কী হবে ?

[মাথা চুলকাতে চুলকাতে] এটা আমিও ভাবছি কী যে করা যায়।

ও স্যার, হিমুকে একবার আমেরিকা নিয়ে যান।

কেমনে নেব ? ও তো গরিব। ওর [illegible] কেনার টাকা থাকে না, ও আমেরিকা যাবে কেমনে ?

স্যার, মনে করুন, কোনো বড়লোক তাকে নিয়ে গেল—ওর বাসায় কাজ করার জন্যে নিয়ে যাবে নিউইয়র্ক।

২৫ শে মে ২০১২ ছিল নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদের শেষ দিন। সেদিন প্রাণখুলে কথা বলেছিলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে



মাথা খারাপ। হিমুর আত্মসম্মান আছে না? ও কি চাকর হতে চাইবে?

সাংবাদিকদের মধ্যে হাসির রোল। একজন প্রশ্ন করে—

স্যার আপনার এই অবস্থায় পাঠকদের জন্যে কিছু বলার আছে?

[কাঁচুমাচু করে] বলার একটাই আছে, সবাইকে বলব আগের পড়া সবগুলো বই পুড়িয়ে ফেলো, আবার নতুন করে কেনো, তাহলে কিছু টাকাপয়সা আমিও পাব। বুঝতেই তো পারছো, এই চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি একেবারেই ফতুর।

বলেই উনার বিশেষ একটা ভঙ্গিতে মুচকি করে হাসলেন। এই হাসির পর তিনি ভিডিও ক্যামেরায় প্যান করার মতো তার চোখও প্যান করেন সামনের সবগুলো মুখের উপর। কে কেমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে তা-ই দেখছেন।

এর মধ্যে একজন সিরিয়াস একটি প্রশ্ন করে বসেন,

স্যার, আপনি কেন লিখেন?

[সিরিয়াস ভঙ্গিতে] আমি আমার আনন্দের জন্যে লিখি। লিখে নিজে আনন্দ পাই। এ জন্যে আমি লিখি।

ঠিক একই প্রশ্নের জবাব আরেকজনকে দিয়েছেন অন্যভাবে। বলেছেন—টাকার জন্যে লিখি। প্রকাশকরা টাকা দেয়, তাদের জন্যে লিখে দিই।

শুধু টেলিভিশন ক্যামেরাই না, হন্তদন্ত হয়ে অনেক সাংবাদিকও এসে পড়েন এই ইন্টারভিউ আসরে। এদের একজন দুলাল খানকে দেখে আমি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে যাই। এই সাংবাদিককে আমি চিনি ১৯৯৬ সাল থেকে। অত্যন্ত সৎ, পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান এই দুলাল খান আমার অনেক প্রিয়ভাজন। হুমায়ূন আহমেদের অসুস্থতার প্রথম খবর আমি তাঁকে জানিয়ে বলি—ঘটনাটা কিন্তু তোমার দৈনিকে ছাপাবা না। সে আমার কথা রেখেছিল। পরদিন অন্য পত্রিকায় নিউজ দেখে আমাকে ফোন করে। আমি বলি—মাজহার আমাকে বলেছে হুমায়ূন আহমেদ আমেরিকা রওনা হওয়ার

২৫ শে মে ২০১২। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হুমায়ূন আহমেদ



আগে যেন মিডিয়াতে খবরটা কোনোভাবে না আসে। কারণ অসংখ্য ভক্ত-স্বজন বাড়িতে এসে ভীড় করবে যা হুমায়ূন আহমেদ এ মুহূর্তে চাচ্ছেন না। কে কার কথা শোনে, তারপরও পত্রিকায় খবর হয়ে যায় যে হুমায়ূন আহমেদ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে গেছেন, ২ দিন পর সিঙ্গাপুর থেকে দেশে আসবেন।

গত ১ মে থেকে দুলাল খান আমার পিছে লেগে ছিল—ভাই, আপনি যখনই যাবেন, আমাকে নিয়ে যাবেন, আমি একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ করব তাঁর। আমি মুখে বলি—ঠিক আছে। কিন্তু পরিস্থিতি তো আমি জানি, তাঁকে কী করে সেই আসরে নেওয়া যায় ? যেখানে তিনি সাংবাদিক পরিচয়ের কারো সঙ্গে কথা বলেন না। একবার মনে হয়েছিল, আজ, এই ২৫ মে শুক্রবার, নুহাশপল্লীতে তাঁর শেষ দিনে যদি মুড ফুরফুরা থাকে, তবে তাঁকে ফোন করব। দুলাল চলে আসবে। গত ৪-৫ দিন সে আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করে নি। আজ হঠাৎ দেখি, সকাল সাড়ে ন'টায় সে চলে এসেছে। বলি—এলে কী করে ?

কেন, বাসে।

বাস তো এখানে আসে না।

দুইটা বাস বদল করে ঢাকা থেকে হোতাপাড়া, সেখান থেকে টেম্পুতে পিরুজালী বাজার, ওখান থেকে রিকশা। আজ শুক্রবার তো, জ্যামট্যাম নাই, সাড়ে তিন ঘণ্টায় চলে এসেছি। ভোর ছ'টায় বাসে উঠেছি।

খুব মায়া লাগল দুলালের জন্যে। বললাম, আসো, আমার সঙ্গে। দুলাল খান আমার সঙ্গী হয়।

এর মধ্যে নাসির আলী মামুন এসেছেন বেশ কিছুক্ষণ আগে। তিনি এর আগে ২০০৫ সালে শেষ বারের মতো এসেছিলেন এখানে। সেদিন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন। ছবি তুলেছিলেন। বাংলাদেশের এই ফটোগ্রাফার সেলিব্রেটিদের পোর্ট্রেট তোলেন। তাঁর সংগ্রহে বিগত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে দেশি-বিদেশি বহু বিখ্যাত লোকের পোর্ট্রেট আছে। এখন হুমায়ূন আহমেদের ছবি তুলবেন। তার হাতে দু'টো ক্যামেরা। একটা প্রফেশনাল। আরেকটা সিগারেট বাক্সের মতো অ্যামেচার অটোফোকাস ক্যামেরা। আমার হাতে দ্বিতীয় ক্যামেরাটি ধরিয়ে দিয়ে বলেন, আমার সঙ্গে স্যারের কিছু ছবি তুলে দেন শাকুর ভাই। আমি দু'তিনটা টিপ দিয়ে তাকে ক্যামেরা ফেরত দেই। বলি বাসায় গিয়ে মেইল চেক করেন। এর মধ্যে আমি আমার আইপ্যাডে আপনাদের অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলেছি। আমার ফেসবুকে পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনাকে ট্যাগ করা আছে। দু'তিনটা আলাদা আছে, আমি মেইল করে দিচ্ছি।

হুমায়ূন আহমেদ সাংবাদিক দলকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। তাঁর হাত ধরে আছে নিষাদ। নিষাদ বাবাকে ছাড়ছে না। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বোটানিক গার্ডেনের গাইডেড ট্যুর শুরু করে দেন। এসব এক সময় আমিও মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। এখন প্রায় মুখস্থ তারপরও তার সঙ্গে থাকি। সঙ্গে দুলাল খানও।



২৫ শে মে ২০১২। পুত্র নিষাদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন হুমায়ূন আহমেদ

তার ঔষধি বৃক্ষের বাগানের সামনে দেখি নতুন একটা সাইনবোর্ড লেগেছে। এখানে আগে অন্য একটা সাইন বোর্ড ছিল। রাশেদ হুমায়ূন ঔষধি বৃক্ষের উদ্যান, আমার ছোট বাবা। রাশেদ ছিল নুহাশের বড়ভাই। জন্মের সময়ই বা খানিক আগে সে মারা যায়। রাশেদ মারা না গেলে হয়তো এই বাগানবাড়ির নাম রাশেদপল্লী হতো। রাশেদ নাই, তার ছোটভাই এবং হুমায়ূনের বড় ছেলে নুহাশের নামে হয়েছে এই সাম্রাজ্যের নাম।

হুমায়ূন নিষাদকে নিয়ে হাঁটতে থাকেন বাগানের ভেতর দিয়ে। সাংবাদিকদের গাছ চেনান, গাছের গল্প বলেন। এক সময় একটা বড় কুয়ার পাশে গিয়ে বসেন নিষাদকে নিয়ে। কুয়ার জলে ছায়া পড়েছে বাপ-বেটার। বাবা ছেলেকে নিজের ছায়া দেখান। তাদের মধ্যে তখন কী কথা হয়, শোনা যায় না। নাসির আলী মামুন তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত, আমি আছি আমার ট্যাবলেট নিয়ে। দু'জনই ছবি তুলছি। হুমায়ূন টিলা বেয়ে নিচের দিকে নামেন। নিচের একটু সমতলেই আছে পদ্মপুকুর। এই পদ্মপুকুরে আছে পৌরাণিক কাহিনির দুই চরিত্র। একজন দৈত্য আর আরেকজন মৎস্যকুমারী। গোলাকারের এই জলাশয়টি পদ্মপাতায় ভরা। ছোট ছোট লালপদ্ম, গোলাপিপদ্ম ফুটে আছে। কোনোটি পেখম মেলেছে, কোনোটি এখনো লাজনম্র অবগুণ্ঠনা কিশোরীর মতো আড়াল করে আছে পাতার কোনায়। এই পদ্মপুকুরের পাড়ে বসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মাঝখানের সাদা মৎস্যকুমারীটির দিকে। প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে বানানো এই মূর্তিটির কোমর থেকে উপরের অংশ এক নারীর, নিচের অংশ মাছের। আব্রুহীনা এই কুমারী বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে তার ডান স্তনটির বোঁটা ধরে রেখেছে, যেন লালপদ্ম তুলে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই কুমারী।



২৫ শে মে ২০১২। সাংবাদিক দুলাল খান প্রশ্নবানে জর্জরিত করেন হুমায়ূন আহমেদকে

পদ্মপুকুরের পাড়ে আর দৈত্যের আঙুলের উপর কিছুক্ষণ বসে ধীরে ধীরে নেমে যান দিঘির দিকে। এই দিঘিটার পাড়েও দেখি নতুন একটা ভিত্তিস্তম্ভের মতো স্তম্ভ বানানো হয়েছে। এটাও আগে চোখে পড়ে নি। প্রায় ২ ফুট বর্গাকার প্ল্যানের উপর একপাশে আড়াই ফুট, অপরপাশে তিন ফুটের মতো উঁচু একটা বেদি, গোলাপি রঙের আস্তরণের মধ্যে মাঝখানে মার্বেল পাথরে খোদাই করে লেখা 'দিঘি লীলাবতী'।

এই লীলাবতী তাঁর স্ত্রী শাওনের গর্ভজাত পৃথিবীর আলো না-দেখা কন্যা শিশু। জন্মের আগেই সে-ও মারা যায়। এ নিয়ে হুমায়ূনের অনেক খেদোক্তি পড়েছি পত্রিকায়। ডাক্তারের অবহেলাকে দায়ী করে লিখেছেন তিনি। মেয়েটির নাম দিয়েছিলেন লীলাবতী। এই লীলাবতী পৃথিবীর আলো দেখে নি, বাবাকে দেখে নি, কিন্তু তার লেখক বাবা তার নামে উপন্যাস লিখেছেন একটা। একই নামে নাটকও লিখেছেন। সেই নাটকটি পরিচালনা করেছেন তার জন্মদাত্রী মাতা। তিনি নিজেও অভিনেত্রী, কিন্তু নিজের চরিত্রে নিজে অভিনয় না করে আরেক প্রতিভাবান অভিনেত্রীকে [জয়া আহসান] দিয়ে সেই চরিত্রে অভিনয় করিয়েছেন। কন্যা লীলাবতীর নামে নাম রেখেছেন সামনের দিঘির। এই দুই ভাইবোন আছে আজিমপুর গোরস্থানে। দুই ভাইবোনের নামে নুহাশপল্লীর এক উদ্যান আর দিঘির নাম রেখেছেন তাদের কাছে না-পাওয়া হতভাগ্য লেখক পিতা।

'দিঘি লীলাবতী'র নিচে রবীন্দ্রনাথ থেকে নিয়ে একটা কবিতার লাইন, 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছো নয়নে নয়নে'। বাবা এই স্মৃতিস্তম্ভটির দু'পাশে দু'হাত ভর করে শরীরটা খানিক বাঁকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। পেছনে লীলাবতীর ছোটভাই নিষাদ। সে-ও খানিক তাকায়, কিছুই বুঝে না। আমি আর মামুন ভাই দু'জনই এ সময় বেশ দূরে দাঁড়িয়ে। আমার মনে হলো, বাপ-বেটির

কথাবার্তা চলছে, এমন সময় আমার কাছে যাওয়া উচিত না। হলোও তাই। অনেকক্ষণ কী কী সব বিড়বিড় করার পর, তিনি হাত ছাড়লেন, সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। একবার তাকালেন আকাশের দিকে। যখন তিনি আকাশের দিকে তাকান, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, তাঁর চোখের কোণে বড় ফোঁটার পানি জমেছে এবং আমার ধারণাকে সত্য প্রমাণ করে দিয়েই দেখলাম হাত চলে এসেছে চোখের কোনায়। তিনি চোখ মুছলেন। তাকালেন আমার দিকে, বললেন, চলো।

দূরে আড়ি পেতে থাকা সাংবাদিক, ক্যামেরা। কেউ কোনো কথা বলছে না। প্রশ্নও করছে না।

আমি চাইলাম পরিবেশটা সহজ করে আনতে। এমন সময় কী কথা বলা যায়!

ফালতু একটা প্রশ্ন করি। বলি—স্যার এই দিঘিতে কী কী মাছ আছে?

তিনি তাকার আমার দিকে একবার। আবার পুকুরের দিকে। আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলেন, চলো।

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করি।

কাল রাতে যে 'ভূত বিলাস'-এর পেছনের টেরাসে বসে আড্ডা দিয়েছিলাম, সেটার কাছে গিয়ে থেমে গেলেন। আমার আর হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তিনি হাঁটছেন, তাঁর সঙ্গে সাংবাদিককুলও। খানিক পরে, দিঘি লীলাবতীর উত্তর-পূর্ব কোণের এক



বাঁশঝাড়ের কোনায় ছায়ার মধ্যে বসে পড়েন। ওখানে তাঁকে বাগে পেয়েছে দুলাল খান। এতক্ষণ দুলাল তেমন সুবিধা করতে পারে নি। সে এসেছে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নিতে, তার হাতে অডিও রেকর্ডার। দুলাল খানকে একটি বাঁশঝাড় দেখিয়ে বলেন, এই বাঁশঝাড়টি শুকিয়ে মরে গিয়েছিল। আঙুল উঁচিয়ে বললেন, এই গাছটির শিকড় থেকে নতুন গাছ গজিয়েছে। পুরো বাঁশঝাড়টিই আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অনন্ত সময় বেঁচে থাকবে এটি, কিন্তু আমি থাকব না। এদিকে এসো, এই দেখ নারকেল গাছের সারি, এগুলো একসঙ্গে বড় হয়ে নারকেল দেবে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, কিন্তু আমি থাকব না।

একে একে প্রশ্ন করে যাচ্ছে আর উত্তর দিচ্ছেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর প্রশ্নগুলোর কিছু কিছু জটিল এবং অনেক সংবেদনশীল। অনেকেই এমন প্রশ্ন করতে চেয়েছেন, কিন্তু করেন নি। দুলাল করেছে। হুমায়ূন আহমেদ জবাবও দিয়েছেন।

এরপর তাঁদের মধ্যে যে সকল কথোপকথন হয় তার কিছু নমুনা এমন–থাকবেন না, কোথায় যাবেন আপনি ?

যেখানে সবাই যায়, আমি তো সেখানেই যাব। বড্ড কম সময় আমাদের। কচ্ছপের সমান আয়ুও পাই নি। তারা তো সাড়ে তিনশ বছর বাঁচে। আর আমরা... ? এই কচ্ছপের উদাহরণটা তিনি প্রায়ই দিয়ে থাকেন। তার কেনো এক নাটকেও এক চরিত্রকে বলতে শুনেছি– সামান্য এক কচ্ছপ দুই আড়াইশ বছরের আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আর মানুষকে কেন এত কম সময় দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয় ?

তারপর আকাশের দিকে চেয়ে নিরবে চোখের জল মুছা



এছাড়াও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন করলে তিনি মঙ্গল গ্রহের একটা নাইকন ক্যামেরার উদাহরণ দেন। ধরা যাক– কেউ মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে দেখে কোথাও কিছু নেই। পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে একটা নাইকন ক্যামেরা আছে। তাহলে বুঝতে হবে যে, এখানে এমন কেউ আছে, যে এ ক্যামেরাটা বানিয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তেমনি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তার একজন স্রষ্টাও আছেন। আমি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী।

হুমায়ূন আহমেদ পুত্র নিষাদকে হাতে ধরে পুকুরের মাঝখানে তাকান। সেখানে পানির মাঝে ঢিবির মতো উঁচু শুকনো দ্বীপ। শাখা-প্রশাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি কদম গাছ। নিচে বেঞ্চি পাতা।

সেখানে কি এখন স্যারের যেতে ইচ্ছা করছে?

এখন যেতে ইচ্ছা করছে না। তবে জ্যোৎস্না রাতে অনেকবার জ্যোৎস্নার আলোয় ভিজেছি আমি। মাথার ওপর যে গাছটি দেখছ তার কষ অনেক বিষাক্ত। চামড়ায় সে কষ লাগলে ঘা হয়ে যায়। তবে এখন না পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। মাঝে মাঝে ও গাছ থেকে সাদা রঙের কষ পড়ে। রাবার গাছের মতো হলেও আসলে ওটা রাবার গাছ না।

স্যার, আপনি কি পূর্ব পরিকল্পনা করে লিখতে বসেন?

আমি কোনো রকম চিন্তাভাবনা বা পূর্বপ্রস্তুতি কিংবা পরিকল্পনা করে লিখি না। আমি হলাম স্পন্টিনিয়াস রাইটার। যখন যা মাথায় আসে তা-ই লিখি। তবে চরিত্র হিসেবে বেছে নেওয়া মানুষগুলো আলাদা। প্রতিটি বৃক্ষ যেমন আলাদা ঠিক তেমন। আমি যা কিছুই করি, তার সবই ভালো লাগা থেকে করি। ভালো না লাগলে আমি কিছুই করি না। যে মুহূর্তে আমি লেখালেখি শুরু করি তখন কোনো শব্দই আমার কানের ভেতর ঢোকে না। এ থেকেই বোঝা যায় লেখালেখির ব্যাপারে আমি কতটা ইনভলভ।

পুত্র নিষাদকে নিয়ে কুয়ার পশে বসে হুমায়ূন আহমেদ



ঐতিহাসিক কোনো প্রেক্ষাপট নিয়ে লিখতে গেলে স্পন্টিনিয়াস বিষয়টি কি থাকে আপনার ?

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, তা হলো আমি কিন্তু ইতিহাস লিখছি না। আমি উপন্যাস লিখছি। উপন্যাস লিখি বলেই আমার স্বাধীনতা আমি পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারি। আর যদি ইতিহাস লিখতাম তাহলে কখনই আমি আমার স্বাধীনতাটা ব্যবহার করতে পারতাম না। তবে ছোটখাটো কিছু সমস্যা আছে। যেমন আমি যখন বঙ্গবন্ধুর হত্যা ঘটনা নিয়ে কোনো কিছু লিখি তখন আমি আমার মতো করে লিখতে পারব না। এখানে সঠিক তথ্যগুলো অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। কারণ এখনো অনেকে জীবিত আছেন যারা সঠিক ঘটনাটা জানেন। সেখানে কোনো ভুল তথ্য দিলে তারা কষ্ট পাবেন। আমি যখন *বাদশাহ নামদার* লিখি তখন কিছু যায় আসে না। সেখানে আমি যেটা লিখি সেটাই সত্যি। কারণ এটা একান্তই আমার। বঙ্গবন্ধুর হত্যা ঘটনা নিয়ে আমি যখন *দেয়াল* উপন্যাসটা লিখছি তখন আপত্তি উঠল। আমাকে বলা হলো শেখ রাসেল কাজের ছেলে রমার কাছে ছিল। তার কাছ থেকে এনে রাসেলকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আমার উপন্যাসে আমি লিখেছি, সে ছিল তার দুই ভাবির মাঝখানে। ভয়ে অস্থির ছিল। সেখান থেকে তাকে টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে দুই ভাবিকে হত্যা করা হয়। আদালত থেকে বলা হলো মূল বিষয়টা আসলে এরকম নয়। আমি তথ্য বিকৃতি করেছি। আদালতের আদেশ আমাকে মানতেই হবে। কারণ আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আমার কথা হলো, আমি যা লিখেছি তা বানিয়ে লিখি নি। দুটি বইতে আমি এই তথ্য পেয়েছি। বই দু'টিতে যেভাবে আছে আমি সেভাবে লিখেছি।

স্যার, আপনি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন, এটা শুনে আপনার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?

মৎসকুমারীর ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন হুমায়ূন আহমেদ



অসুখটার কাছ থেকে আমি একটা জিনিস শিখেছি। আর তা হলো টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। প্রতিটি মুহূর্তই খুব মূল্যবান। আমরা যে বেঁচে আছি, নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি তার জন্যে প্রতিনিয়তই একজনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এটা আগেও বুঝতে পারতাম; কিন্তু এটা গভীরভাবে কখনই উপলব্ধি করি নি।

স্যার, এ দেশ নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী ?

আমি ভয়ঙ্কর আশাবাদী মানুষ। আমার মতো আশাবাদী মানুষ খুবই কম আছে। তোমরা তো বীজতলা চেনো, যেখানে ধানের বীজ তৈরি করা হয়। চারা জন্মানো হয়। এই চারাগুলো আবার বিভিন্ন জায়গায় বপন করে ফসল ফলানো হয়। আমি মনে করি, আমাদের পুরো দেশটাই একটা বীজতলা। এখানে মানুষ নামের চারা জন্মানো হচ্ছে এবং তা সারা পৃথিবীতে বপন করা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় দেখা যাবে পুরো পৃথিবীই আমরা দখল করে ফেলেছি।

আপনি যদি কখনো নুহাশপল্লীতে এসে দাঁড়ান তখন সুস্থ হয়ে যাবেন। এখন কিন্তু তেমনই মনে হচ্ছে।

নুহাশপল্লী আমাকে সুস্থ করতে পারবে না। একমাত্র অত্যাধুনিক চিকিৎসাই আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারবে। তুমি যা বলছ তা আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সবকিছু হয় না, পৃথিবীর সবকিছু আধ্যাত্মিকতায় চলে না। পৃথিবী খুবই বাস্তব।

এরপরও বলব আপনার মানসিক শক্তিই তো আপনাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমি এটা বিশ্বাস করি না। মানসিক শক্তি নয়, অর্থই আমাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। পৃথিবীতে অনেক মানসিক শক্তির অধিকারী মানুষ এসেছেন; কিন্তু ভয়াবহ অসুখের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেছেন। স্টিভ জবস কিংবা মুষ্টিযুদ্ধের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জো-ফ্রেজিয়ারের মানসিক শক্তি কি কম ছিল ?

দিঘি লীলাবতীর মাঝখানে তৈরি করা হয়েছে একটা ছোট্ট দ্বীপ আর এই দ্বীপে যাওয়ার জন্য আছে কাঠের সাঁকো



মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন আছে, আপনি সে জীবনের কথা বলুন।

তোমাকে কে বলল মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন আছে? মানুষের মতো পিঁপড়ারও কিন্তু প্রাণ আছে, সমাজ ব্যবস্থা আছে, সোলজার আছে। মানুষ আর পিঁপড়ার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে?

মানুষের বুদ্ধি বিবেক আছে, পিঁপড়ার নেই।

কে বলেছে নেই? তাদেরও বুদ্ধি আছে। তাদেরও সমাজ ব্যবস্থা আছে। তারাও সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানাতে পারে। চাষবাস করে এবং খাওয়ার জন্যে দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সঞ্চয় করে। ওই পিঁপড়াকে যদি আমি পায়ের তলায় পিষে ফেলি, তাহলে তার দফা রফা শেষ। মানুষও এমন। আমাকে এভাবে বলো না। আমি মনে করি না আমার অনন্ত জীবন আছে। আমি মনে করি, যখন আমি মারা যাব তখন মাটিতে মিশে যাব।

আপনি তো অনেক বিখ্যাত, অনেক জনপ্রিয়, কীভাবে সম্ভব হলো তা?

আমার আর তোমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি আর তুমি একই। আমি লেখালেখি করতে পারছি, তুমি পারছ না। কারণ তুমি সে চেষ্টাটা করো নি। করলে তুমিও আমার মতো হতে পারতে। আমি মনে করি আমার মতো সকলের মধ্যেই একই রকম চিন্তাশক্তি, কল্পনা শক্তি, আহরণ শক্তি এবং আনন্দ কাজ করে। কেউ কাজে লাগায় কেউ লাগায় না। আর সবার মতো আমিও একজন। কখনই নিজেকে আলাদা কেউ বলে দাবি করি না।

কোলাহলমুখর রাজধানী ছেড়ে নির্জন এলাকায় এসে কেন নুহাশপল্লী বানিয়েছেন?

গাছের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর মমতা থেকেই আমি নুহাশপল্লী বানিয়েছি। আমার কাছে সব সময় মনে হয়, গাছের কাছে আমরা অসম্ভব রকম ঋণী। ঋণটাকে

কিছুদিন আগে ঔষধি বৃক্ষের উদ্যানের নাম পাল্টে রাখা হয়েছে তাঁর প্রয়াত প্রথম পুত্র রাশেদ হুমায়ূনের নামে

কেউ স্বীকার করছি না। সমানে গাছ কেটে ফেলছি। আগুনে জ্বালাচ্ছি, পোড়াচ্ছি। অথচ প্রতিনিয়ত আমরা গাছের কাছেই হাত পেতে বসে আছি। সুশীতল ছায়া চাচ্ছি, নির্মল বাতাস চাচ্ছি। নুহাশপল্লীর এই গাছগুলো কেউ যেন কাটতে না পারে, যত্নে বেড়ে ওঠে। বলতে পার, গাছের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যেই আমার এমনটা করা।

আমি এখানে থাকব না, নুহাশপল্লী থাকবে। বিষয়টা তো খুব কষ্টের, তাই না ?

কষ্টের কেন ? এটাই তো নিয়ম। আমি মরে যাব, এটাই তো সত্যি! মরার আগে কোনো আফসোস নিয়ে মরতে চাই না। এক জীবনে তো আমি নুহাশপল্লী অনেক দেখলাম।

মৃত্যুটা আসলে আপনার কাছে কেমন ?

মৃত্যুটা আমার আছে খুবই পেইনফুল। একটা মানুষ এত ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে; মাত্র ৭০-৮০ বছরেই তার সব ক্ষমতা শেষ। মানুষের আয়ু এত কম দেখে আমার খুব কষ্ট হয়।

পুনর্জন্ম নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, যদি পুনর্জন্ম হয় তবে আমি মিসির আলি হয়ে জন্মাতে চাই। কারণ, তার যুক্তি অসাধারণ।

অর্থের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আপনার কাছে ?

অর্থ সাংঘাতিক প্রয়োজন আমার। অর্থ ছাড়া কিছুই হয় না। যাবতীয় সুখ কিনতে হলে অবশ্যই অর্থ প্রয়োজন। দূরের কোনো জায়গায় যেতে চাইলেও অর্থ চাই। তাই অর্থ ছাড়া এক মুহূর্তও চলা যায় না।

যখন আপনি থাকবেন না, যারা আপনাকে ভালোবাসে, যারা আপনার ভক্ত আপনার জন্য তাদের হৃদয় তো শূন্য হয়ে যাবে। তাদের উদ্দেশে কী বলবেন আপনি ?

তাদের উদ্দেশে আমি এইটুকুই বলতে চাই—তারা ভালো থাকুক এবং জীবনের প্রতি বোধ তৈরি করুক।

জীবন সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি কী ?

জীবন অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। তারাশংকরের কবির মতো আমার মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছা করে, জীবন এত ছোট কেন ?

পাহাড়, নদী এবং সমুদ্র কোনটা প্রিয় আপনার ?

সমুদ্রই আমার সবচেয়ে প্রিয়। কারণ সমুদ্র প্রতিনিয়তই বদলে যায়। একটা ঢেউ আসে অন্যটা চলে যায়। নতুন নতুন ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার দাপাদাপি আর সাগরের শাঁ শাঁ শব্দ দারুণ লাগে। সমুদ্রের বিশালতাকেও দারুণ উপভোগ করি আমি। সমুদ্র ভালোবাসি বলেই সেন্টমার্টিনে জমি কিনে সমুদ্রবিলাস বানিয়েছি। কতদিন সেখানে যাই না। শেষ বয়সে আমি সমুদ্রের শব্দ শুনে শুনে কাটিয়ে দেব সে আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমি সেন্টমার্টিন এবং টেকনাফে জায়গা কিনেছিলাম।

দুলাল খানের প্রশ্ন যেন শেষ হয় না। কিন্তু হুমায়ূন উঠে দাঁড়ান। দুলাল তার হাতে রাখা অডিও রেকর্ডার মুখের কাছে বাড়িয়ে নতুন আরেকটা প্রশ্ন করতে যায়। হুমায়ূন তাকে থামান। বলেন, অনেক হয়েছে, আর না। এবার তুমিই প্রশ্ন করো, এবং সে উত্তর তুমিই দাও। মনে করো সব প্রশ্নের উত্তরই আমি দিয়েছি। এ নিয়ে প্রতিবাদ করতে আসব না কোনোদিন।

হুমায়ূন হাঁটতে শুরু করেন। এক সময় হুমায়ূন পুরো দিঘিটি চক্কর দিয়ে, টিলা বেয়ে আবার উপরে উঠে যান।

উপরে গিয়ে দেখি আরো অনেক লোকজন এসেছেন। কেউ কেউ বৌ-বাচ্চা নিয়ে, কারো হাতে টিফিন ক্যারিয়ার। খাবার নিয়ে এসেছেন। আজ যে এত মেহমানের আগমন ঘটবে, এটা সম্ভবত জানা ছিল তাঁদের। নুহাশপল্লীর রন্ধনশালাটি সকাল থেকেই বেশ ব্যস্ত। যে সকল মেহমানের আগমন ঘটেছে, তারা সবাই হুমায়ূনের পরিচিত। তবে যে সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তিনি তারকা বানিয়ে বাজারে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাদের আগমন অনেক কম। তারা অনেক ব্যস্ত শুটিং নিয়ে। এদের মধ্যে অতি নিবেদিত প্রাণ মানুষটিকে দেখলাম—তিনি ডাক্তার এজাজ। ভোরবেলাই চলে এসেছেন, হাতে তাজা কৈ মাছ একটি বালতিতে। তিনি অতি কম কথা বলেন, স্যারের সঙ্গে কখনো থাকেন না, কিন্তু কাছে থাকেন। হঠাৎ দরকার হলে যাতে তাঁকে পাওয়া যায়।

একটা সাদা রঙের প্রাইভেট কার থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে নামলেন অভিনেতা সালেহ আহমেদ। তিনি যথেষ্ট অসুস্থ। শুধু ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি হাঁটতে পারছেন না। আরও দু'জন সাহায্য করে তাঁকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়। অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছেন এক সময়কার *সচিত্র সন্ধানীর* সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দিন, প্রবীণ সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, সালেহ চৌধুরী, মাহবুব আজিজ প্রমুখেরা।

বেলা বারোটার মধ্যে নুহাশপল্লীর চত্বরটি, শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়ে যায়।

দুপুরবেলা সবার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা হয়। খাবারের একটা অংশ হুমায়ূনের ঘর, অপরটি বৃষ্টিবিলাস চত্বর। তাঁর ঘরের মধ্যে যে সকল মেহমানের খাওয়া দেওয়া হয়, তাঁদের অনেকেই চেয়েছিলেন হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে খাবেন। কিন্তু হুমায়ূন এসে বললেন তিনি তাঁর মা'র সঙ্গে খাবেন। মেহমানদের খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে যায়। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে একে একে মেহমান ও সাংবাদিকেরা ছেড়ে যান নুহাশপল্লী।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাসমতো, খাবার পর একটু সময় বিছানায় গড়াগড়ি করেন।

সন্ধ্যার পর নুহাশপল্লী ছেড়ে দেন সবাই। দখিন হাওয়ায় রাতে পৌছবেন, বাকি চার রাত থাকবেন সেখানেও।

সেদিন একটা ঘটনা আমাদের জানালেন দু'দিন পরে দখিন হাওয়ার আড্ডায়। ঘটনাটি *সমকাল* সম্পাদক গোলাম সারওয়ারকে নিয়ে।

২৫ মে দুপুর বেলা খাওয়ার পর বসে আছেন নিজের ঘরে। বেডরুমের মেঝের উপর বসে আড্ডা চলছে। সস্ত্রীক মাজহার-কমল-শাওন আর হুমায়ূন। এক সময় গোলাম সারওয়ার এলেন বিদায় নিতে। বিদায় নিতে এসে তিনি চাইলেন একেবারে একান্তে হুমায়ূনের সঙ্গে কিছু কথা বলতে। এ প্রস্তাব শুনে বাদবাকিরা বেশ বিব্রত, বিব্রত হুমায়ূনও। কিন্তু এত সিনিয়র একজন লোক চাইছে যখন আলাদা কথা বলতে, তাঁর জন্যে সুযোগ করে দিলেন হুমায়ূন। বাকিরা সবাই চলে গেল। দরোজা বন্ধ করলেন গোলাম সারওয়ার। তারপর গিয়ে বসলেন হুমায়ূনের পাশে। নিজের পকেট থেকে একটা খাম বের করে হুমায়ূনের পকেটে ভরে বললেন, এটা আপনাকে রাখতে হবে।

হুমায়ূন বুঝলেন, ঘটনা ঘটে গেছে। তিনি ডলার দিচ্ছেন। যতটুকু শুনেছি, ইতোমধ্যে তাঁর মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ৫ হাজার ডলার ছাড়া তিনি কোনো বন্ধু বা স্বজনের কাছ থেকে চিকিৎসার জন্যে টাকা নেন নি। গোলাম সারওয়ার চিকিৎসার জন্য টাকা দিচ্ছেন এবং কোনো সাক্ষী না রাখার জন্যে এ আয়োজন করছেন তিনি নিজে। হুমায়ূন তাঁর অপারগতার কথা জানালেন সারওয়ার ভাইকে। তিনি এবার হাতে ধরলেন হুমায়ূনের। বললেন, এটা আপনার চিকিৎসা খরচের জন্যে নয়। আপনার অপারেশনের পর যখন আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন তখন যাতে বৌ-বাচ্চা নিয়ে আমেরিকা ঘুরতে পারেন, তার জন্যে। এখানে চার হাজার ডলার আছে, এটা দিয়ে যে-কোনো একটা সুন্দর জায়গায় আপনি বেড়াবেন, এ জন্যে এটা। এটা আপনাকে রাখতেই হবে বলে জোর করে পকেটে ঢুকিয়ে দেন। সারওয়ার ভাই নুহাশপল্লী ছেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর ঘনিষ্টজনদের পুরো ঘটনার বর্ণনা দেন।

হুমায়ূন অতঃপর পাড়ি দেন আমেরিকা। ডাক্তার তাকে যে সকল ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন, তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছিলেন। একমাস আগে ঠিক করা তারিখমতো তিনি যথাসময়ে অপারেশনের জন্যে পৌঁছে যান অপারেশন থিয়েটারেও।

একসময় তার সফল অপারেশনও হলো। ফিরে এলেন নিউইয়র্কে তাঁর ভাড়া বাড়িতে। আর কিছুদিন পর যখন সারওয়ার সাহেবের ইনভেলাপ খুলে ডলার বের করবেন, বৌ-বাচ্চাকে নিয়ে রকি মাউন্টেন দেখতে যাবেন, তার আগেই আরেকবার ফেরত যেতে হয় হাসপাতালে। তারপর রকি মাউন্টটেন হাই নয়, ফিরে এলেন আবার নুহাশপল্লীতে। একেবারে নড়াচড়া করতে না পারা প্রাণহীন এক মানুষ, অনন্ত কালের জন্যে লম্বা ঘুমের জন্যে শুয়ে থাকলেন সেই লিচু তলায়।

শ্রাবণ মেঘের দিন

২৪ জুলাই ২০১২। আজ আমার বাবার মৃত্যু তারিখ। ১৯৮৫ সালের এই তারিখে ভোরবেলা আমার সামনেই আমার বাবা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর ফুসফুসে ক্যানসার হয়েছিল। তিনি জাহাজে চাকুরি করতেন। অসুখ ধরা পড়ে মাল্টায়। সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়া হয়ে তাকে ফেরত পাঠানো হয় দেশে। প্রায় ১৮ মাস নানাভাবে বেঁচে ছিলেন। সে অনেক কাহিনি। আমার বয়স তখন ১৯-২০-এর মতো। সংসারের বড় ছেলে। কত চাপ।

বাবার মৃত্যুর দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সেদিন সকালটা খুব ঝকঝকে ছিল। দুপুরের পর পরই গুড়িগুড়ি বৃষ্টি এলো। জোহরের নামাজের পর গ্রামের লোকগুলো তাঁকে নিয়ে আমাদের পারিবারিক গোরস্থানে কবর দিল।

আমার সবচেয়ে ছোটভাইটির (রাসেল) বয়স তখন ৫ বছর ছিল। বাবার লাশকে যখন সাদা কাপড়ে মোড়া হচ্ছিল, সে বারবার বলছিল, বাবাকে এরকম কাপড় পরানো হচ্ছে কেন ? তার আরও অনেক প্রশ্ন ছিল। যেমন বাবাকে ওরা নিয়ে গেল কেন ? বাবা আসছে না কেন ? এসব [illegible] প্রশ্নের জবাব আমার কাছে তখন জানা, আমি কেন, কেউই তার সে সব প্রশ্নের জবাব দেয় না। আমার মনে আছে, বাবাকে কবরে নামানো হচ্ছে, আমি পাশে দাঁড়িয়ে। কেউ একজন আমাকে বললেন, নিচে নামতে। আমি নামি না, ভয় পাই। বাবাকে শোয়ানো হলো, একজন আমাকে বললেন, প্রথম মাটির ঢেলাটা যেন আমি দেই।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমার মাথার উপর যেন ছাতা ধরে রেখেছে। কিন্তু আমি ভিজে আছি, আমার সারা শরীরে কাদা মাখানো। আমি একটুকরো কাদা ছুড়ে মারলাম বাঁশের মাচার উপরে। তারপর বাবার লাশ ধীরে ধীরে আমার কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর কখনো দেখা হয় নি। ছুটিছাটায় বাড়ি গেলে দূর থেকে দাঁড়িয়ে কবর জিয়ারত করি। এইটুকুই।

গ্রামের বাড়িতে আমার মা থাকেন প্রায় একা। তার বড় ছেলে হিসাবে আমি থাকি ঢাকায়। দুই ছেলে বিলেত, এক মেয়ে আমেরিকায়, আরেক মেয়ে আছে বিয়ানী বাজারে।

জুলাই মাস এলেই বিদেশে থাকা আমার ভাই-বোনেরা বেশ অস্থির হয়ে যায়। বিশেষ করে আমেরিকায় থাকা আমার ছোটবোন নুরু। বাবার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হবে ২৪ তারিখে, মসজিদে শিরনি যাবে, বাড়িতে মৌলানারা এসে খতম পড়বে, কবর জিয়ারত হবে। এসবের আয়োজন চলতে থাকে।



২৪ জুলাই ২০১২। তাঁর অন্তিম অভ্যর্থনার জন্য নুহাশপল্লীতে ব্যাকুল মানুষ

এ বছর আমার সবচেয়ে ছোটভাই দেশে এসেছে। কিছুদিন আগে তাঁর বিয়ে হয়েছে। তার বউয়ের লন্ডন চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু নতুন পরিবারে এসে শ্বশুরের মৃত্যুবার্ষিকী সামনে রেখে সে-ও লন্ডন যাচ্ছে না, ২৪ তারিখের পর যাবে। এ বছর মৃত্যুবার্ষিকীটা অনেক বড় করে আয়োজন করবে তারা। তারা চাইছে আমিও যেন সেদিন উপস্থিত থাকি।

অথচ আমি অবাক হয়ে দেখি, ১৯ জুলায়ের পর তারা কেউই আমাকে এ বিষয়ে কোনো কিছু জানায় না। এমনকি আজ ঢাকার বারডেমের হিমঘর থেকে তাঁর লাশ নিয়ে এখানে এই নুহাশপল্লীতে আসা পর্যন্ত আমি নিজেও বাড়িতে ফোন করে কোনো খোঁজ নিই নি।

২৩ জুলাই ভোরবেলা তাঁর লাশ এসে পৌছে ঢাকায়। সেখান থেকে শহীদ মিনারের নাগরিক শ্রদ্ধাঞ্জলির শেষে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হিমঘরে। লাশ কোথায় দাফন হবে এ নিয়ে ফয়সালা হতে সময় লাগে প্রায় ১৫ ঘণ্টা। কাল মধ্যরাতে সিদ্ধান্ত হয় লাশ দাফন হবে এই নুহাশপল্লীতেই লিচু গাছের তলায়। সকাল সাড়ে ন'টায় লাশবাহী গাড়িটি ঢাকা থেকে রওয়ানা দেয়। এসে পৌছে দুপুর বারোটার দিকে।

আজও সেই ১৯৮৫ সালের মতো দেখি অবস্থা। সকালটা ফকফকা ছিল, তিনি এসে ঢুকতেই আকাশ ফাটিয়ে ঝরে পড়ল শ্রাবণ মেঘের ধারা।

পিরুজালী বাজারের মোড় থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পথের প্রায় পুরোটুকুই গাড়িতে ঠাসা। এ সড়ক এর আগে কখনো দেখে নি এমন গাড়ির স্রোত। নুহাশপল্লীর মাঠের সবুজ নরম ঘাসের ডগায় এত শত পায়ের ছাপও না।



বৃষ্টির মধ্যেই ৩-৪টি টেলিভিশন অনলাইন ব্রডকাস্টিং শুরু করেছে তাঁর দাফনের প্রক্রিয়ার। লিচুতলায় শুরু হয়েছে কবরের জন্যে আয়োজন। সবকিছু একা সামলাচ্ছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী, শাওনের বাবা।

আরেকটা ছোট শামিয়ানার নিচে রাখা হয়েছে তাঁর কফিন।

এক সময় দেখি, '*নয় নম্বর বিপদ সংকেত*'-এর চিত্রনাট্যের যেন বাস্তব রূপ নিয়ে তাঁর কফিনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পুত্র-কন্যারা। হায়রে নিয়তি!

হঠাৎ করে 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'-এর একটা দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠলো। 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'-এ দেখা যায়, একাকিত্বে ভুগছেন সোবাহান সাহেব। বাইনোকুলার দিয়ে তিনি শূন্য বাড়িঘর দেখেন। ছেলেমেয়েদের জন্যে আকুল হন। তিনি বলেন, 'আমার দুটো মেয়ে। তিনজন নাতি-নাতনি। কেউ এখানে আসে না। স্বর্গ বানিয়ে রেখেছি। তারপরেও এখানে কেউ আসে না।' এখন কীভাবে ছেলেমেয়েদের আনা যায়? সোবাহান সাহেবের ম্যানেজার জানান, তিনি মারা গেছেন শুনে তার ছেলেমেয়েরা আসবে। সত্যিই তাই, বাবার মৃত্যুর কথা শুনে ছেলেমেয়েরা হাজির হয়। বড় মেয়ে বাবার খাটিয়ার পাশে গিয়ে বলে, 'ও বাবাগো ও বাবা। তুমি কীভাবে চলে গেলে? এখন কাকে আমি বাবা ডাকব?' তখন সোবাহান সাহেব খাটিয়া থেকে উঠে বসে বলেন, থাপড়ায়ে দাঁত ফেলে দিব। তিন বছরে একবার খোঁজ নিয়েছিস ফাজিল মেয়ে! বলে কাকে আমি বাবা ডাকব!

বাপের প্রতি নির্মম অভিমানে যে কন্যারা তাঁর জীবদ্দশায় এই নুহাশপল্লীর চত্বর থেকে দূরে ছিলেন তারা এখন সামিল হয়েছেন শবযাত্রার বিদায়ী আয়োজনে। সিনেমার মতো যদি এখন কফিন খুলে বেরিয়ে এসে হুমায়ূন বলতেন—এই, আমি কিন্তু মৃত্যুর অভিনয় করলাম। মরি নি, দেখলাম—আমার মৃত্যুর পর তোমরা কে কী করবে তার জন্যে এই মৃত্যু-মৃত্যু খেলাটা খেলেছিলাম মাত্র। আসো, আমার ঘরে আসো, বসো। এই কুসুম, তুমি একটু রেস্ট নাও আমি আমার মেয়েদের সঙ্গে একটু গল্প করব, আর আমার স্যুটকেসটা দাও তো, নিউইয়র্ক থেকে আমার নাতি-নাতনির জন্যে যে কাপড়গুলো কিনেছি, ওগুলো বের করো।

এমন তো তিনি শুরু করেছিলেন ১৯৯৫-৯৬ সালে, সেই 'আজ রবিবার' থেকে। 'আজ রবিবার'-এ বৃদ্ধ পিতা তার কবরের ডিজাইন করিয়েছিল, পাগলা মামা কফিনের ভেতর শুয়ে কবরের স্বাদ নিয়েছিল। তার ১৫-১৬ বছর পর যখন এই নুহাশপল্লীকে নিয়েই ছবি বানালেন 'নয় নম্বর বিপদ সংকেত'—তখনও কিন্তু সেই চিন্তারই প্রকাশ ঘটালেন। মাঝখানে তাঁর নিজের চরিত্রটা নিয়ে এলেন।

সিনেমা বা নাটকের কাহিনি বদল হয়ে যায় নিমেষে। মানুষ আরো কতগুলো মানুষকে নিয়ে অনেক নাটকীয় ঘটনার জন্ম দেয়, মৃত্যু দেয়। সে যা চায় তা-ই পারে। কিন্তু এই বিশ্ব নাট্যমঞ্চে আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষকে নিয়ে যে নাট্যকার-নির্দেশক নাটক সাজিয়েছেন তার নির্দেশকে অবজ্ঞা করবে এমন সাধ্য কোন নটের? যদি তা-ই হতো, তাহলে এই ডেথ সিনকে ইমপ্রোভাইজ করে কফিন থেকে বেরিয়ে আসা হয়তো কোনো ব্যাপারই ছিল না।

পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে হুমায়ূন আহমেদ নামক যে চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোনার এক গ্রামে, এই চরিত্রের সমাপ্তি ঘটে গেছে ২০১২ সালের ১৯ জুলাই নিউইয়র্কে। চরিত্রের সমাপ্তি ঘটলেও মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্যে তার এক্সিট পয়েন্ট ঠিক করে রেখেছেন এই নাট্য পরিচালক। তাঁর জন্যে রেখেছেন এই নুহাশপল্লীর সবুজ চত্বর।

১৯৮৫ সালে আমার উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, আমার সাহস ছিল না বাবার কফিন নিয়ে গোরস্থানে যেতে। আমি লাশের বহরের সঙ্গে ছিলাম। এবার বয়স হয়েছে, কিঞ্চিৎ সাহসও। অনেকের সঙ্গে আমার কাঁধও ছিল কফিনের করালে।

কফিনের সামনে দেখি নুহাশ।

২৪ জুলাই ২০১২। সেদিন ছিল শ্রাবণ মেঘের দিন





নুহাশ আজ পরেছে বেদানার রঙে রাঙানো নীল রঙ একটা পাঞ্জাবি। কাল বিমানবন্দরে যখন বাবার লাশ নিতে এসেছিল, তখন তার গায়ে ছিল হলুদ রঙের ফতুয়া। যেন বাবার তৈরি চরিত্র 'হিমু'র সাজ নিয়েছিল কাল।

কাকতালীয় হলেও সত্যি যে, আড়াই মাস আগে চিকিৎসা বিরতিতে যখন হুমায়ূন এসে নামেন ঢাকার এই বিমানবন্দরের এই ভিআইপি টার্মিনালে তখন তাঁর দুই পুত্র নিষাদ আর নিনিতও হলুদ রঙের টি-শার্ট গায়ে দিয়ে এসেছিল।

কবরের পাশে এসে কফিন নামানো হয়। ওপাশে নুহাশ দাঁড়িয়ে। নুহাশের এখন যা বয়স, ১৯৮৫ সালে আমার বয়স অনেকটা সে রকমই ছিল। নুহাশ কী করবে সে জানে না। একজন বলল, নুহাশ, তুমি নামো। সে সময় আমি কিন্তু সাহস পাই নি, নুহাশ পেয়েছে। কাদামাখা কবরের গর্তে নেমে গেল নুহাশ।

এবার লাশ কবরে নামানোর পালা। তাঁর পা যেদিকে আছে, আমি সেপাশে দাঁড়ানো।

লাশ নামানোর জন্যে ওটাকে হাত দিয়ে ধরতে হয়। আমি এই জীবনে কোনো লাশ ছুঁই নি। আজ ছোঁব। আমি, অনেকের সঙ্গেই একটা পা ধরলাম। ডিপ ফ্রিজের ভেতর থেকে লম্বা মাছ বের করে আনলে ওটাকে যে রকম শীতল-শক্ত মনে হয়, পা'টাও দেখি সে রকম। হিমঘরে থেকে পুরো শরীরটা হিমায়িত।

তারপরের প্রক্রিয়াগুলো খুবই স্বাভাবিক। আমি বারবার নুহাশকে দেখি এবং ২৭ বছর আগের আমাকে দেখি।

বৃষ্টি থেমে যায় একসময়। ধীরে ধীরে মানুষের স্রোতেও ভাটা পড়ে। নুহাশপল্লীর সবুজ ঘাসের চত্বর কাদার প্রলেপে ঢেকে যায়। অনেক দূরে একটা গাছের তলায় বসে থাকি।

আমার মা'র ফোন আসে। বলেন, চিন্তা করিস না, মিলাদের সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। আজ তোর বাবার জন্যে দোয়ার সময় একসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের জন্যে দোয়া হবে।

২৭ বছর আগে বাবাকে কবর দিয়ে এসে পুকুর পাড়ে বসেছিলাম। আমার কান্না আসে নি। আজ বসে আছি সেই জাপানি বটের তলায়। আমার কি কান্না আসছে এখন? আমি ঠিক বলতে পারব না।

এই জগৎ নাট্যের নাটশালার নটবর তার তৈরি নট-নটিদের নিয়ে কখন কী আসর সাজান আমরা বুঝতে পারি না।

নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন আহমেদের কফিনের পাশে প্রথম পক্ষের সন্তানেরা, ডানে কফিন নামাচ্ছেন নুহাশ



